মরম ভরম

সমরেশ বসু

শিলালিপি
৫১, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কোলকাতা-নয়

, প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৩৫৭, অগাষ্ট, ১৯৫০
প্রকাশক : শ্রীঅরুণকান্তি ঘোষ, ৫১, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কোলকাতা-নয়
মুদ্রক : শ্রীবিজয়কুমার ঘোষ, জয়শ্রী প্রেস,
৯সি, শিবনারায়ণ দাস লেন, কোলকাতা-ছয়

প্রচ্ছদ :
সুবোধ দাশগুপ্ত

বৎসরাধিক কাল বাদে, আবার আমি মনুষ্য সান্নিধ্যে গুণগুণ করতে এসেছি। আমি একটি পতঙ্গ মাত্র, কিন্তু আমাকে নিয়ে বহুবিধ কাব্য রচিত হয়েছে। আমার রূপ নিয়ে, কবিকুল যে কত রকমের তুলনা দিয়েছেন, তারও কোন তুলনা নেই। বৈষ্ণব কবিগণ, স্বয়ং কৃষ্ণের সঙ্গে আমার রূপের তুলনা দিয়েছেন। অবশ্য এ স্থানে তুলনা বলতে আমার রঙের কথাই বলছি। কৃষ্ণ কালো, ভ্রমর কালো। তা ছাড়াও রূপসী রাধা বা অন্যান্য সুবর্ণ-অঙ্গে নায়িকাদের আয়ত-চোখের কালো তারাযুগলের সঙ্গেও আমার রূপের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যেমন ভ্রমর কালো চোখ।

অনেকে হয়তো ভাবেন, আমি এতে বিশেষ গৌরব অনুভব করি। একেবারে যে করি না, এমন নয়। সামান্য একটি পতঙ্গ হয়ে যদি আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি, তাহলে গৌরব বোধ করব বৈ কি! তা ছাড়া দেখুন, আমার নামেরই কত রকমের বাখান। এক তো, ভ্রমর নামের মধ্যেই যেন আপনারা একটি কাব্যিক ধ্বনি ও চিত্র খুঁজে পান। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসের আর এক নাম ভ্রমর। বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ভ্রমর কি নারীর নাম হতে পারে? এটি নিতান্ত নামের ধ্বনিতেই সম্ভব হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র যদি একবার অভিধানে চোখ বুলিয়ে নিতেন তা হলেই দেখতে পেতেন, স্ত্রী ভ্রমরকে ভ্রমরী বলা হয়েছে।

সেই হিসাবে, তাঁর উপন্যাসের নায়িকার নাম হওয়া উচিত ছিল ভ্রমরী। ভ্রমরী নামটিও কি সুন্দর নয়? আপনাদের কাছে, এ সবই কূট তর্ক মনে হতে পারে। নিজের নামটা নিয়ে আমিই বা মানুষের ভ্রান্তিসমূহকে মেনে নিই কেমন করে? এর মধ্যে একটা কথা আছে।

লজ্জার মাথা খেয়ে সেটা আপনাদের কাছে স্বীকার করাই উচিত। আমার নামও ভ্রমরী হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু নিজের নামের বিষয়ে, আমি প্রথম থেকে, বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই ভুল করে বসে আছি। এখন আর সেই ভ্রমের সংশোধন সম্ভব নয়। ভ্রমরী হয়েও, আমি চিরকালের জন্য আপনাদের কাছে ভ্রমর নামেই থেকে যাব।

কিন্তু অতঃপরেও কিছু কূট তর্ক থেকে যায়। ভ্রমরকে কেউ কেউ, বিশেষত কবিরা ভ্রমরা বা ভোমরা বলেছেন। কিছু মনে করবেন না, কবিরা চিরকালই কিছু বায়ুগ্রস্থ হয়ে থাকেন। তবে সে-বায়ু সম্ভবত উনপঞ্চাশী বায়ু নয়। চিন্তা ও কল্পনার হাইটেনড্ অবস্থার সঙ্গেই আমি কবিকূলের বায়ুগ্রস্ততার কথা বলছি। সে-বায়ু না থাকলে, কবিরা বোধহয় কবিতা সৃষ্টিও করতে পারতেন না। তবে যে কথাটি আমি বলতে চাইছি, তা হল, এত যে আমার নাম, তার কি সত্যি নর নারীর মতো কোন পরিচয় বা জীবনযাপন আছে ?

আমাকে অভিধানে নানা নামে ভূষিত করা হয়েছে। ভৃঙ্গ, অলি মধুপ, মধুকর, এমন কি মৌমাছিও। মিথ্যাও নয়, আমরা একই প্রজাতির বিভিন্ন শাখা। আপনারা যদি মনে করেন, বোলতা বা ভীমরুল মোটেই মধুপায়ী নয়, তাহলে খুবই ভুল করবেন। তবে হ্যাঁ, বলতে পারেন, এরা একটু সন্দিগ্ধপরায়ণ এবং গোঁয়ার। আসলে ভীতু। অনেকটা আল্‌কেউটে সাপের মতো। ভয় পেয়ে ওরা অনেক সময় নিজের ছায়াকেই ছোবলায়। ভাবে, এই বুঝি কেউ আমার প্রাণহরণ করতে এসেছে। সেইজন্য মানুষ দেখলেও তারা ফণা তুলে তাড়া করে। বোলতা ভীমরুলও অনেকটা সেই রকম। কোন কারণে মানুষের হস্ত সঞ্চালনকেও সে তার প্রতি আক্রমণের আশংকা করে। ভীমরুল তো তার বাসার কাছে পিঠে কাউকে ঘেঁষতে দেয় না। ভাবে, এই বুঝি আমার বাসা ভাঙতে এলো। অমনি তেড়ে এসে হুল ফুটিয়ে দেবে।

আসলে আমার আপত্তিটা পণ্ডিতদের ব্যাখ্যায়। অভিধানগত অর্থে, আমরা একই প্রজাতির বিভিন্ন শাখা হলেও, এমন কথা কখনো শুনেছেন কি, মৌমাছি, বোলতা বা ভীমরুলের মতো, ভ্রমররা চাক বেঁধেছে? ভ্রমরের চাক কেউ কখনো দেখেছেন কি? বোধহয় না। আমরা একটু যাযাবর জাতীয়। তবে যতটা আমাদের নামে কলংক আরোপ করা হয়, রমনী মোহন পুরুষরা যেমন বিভিন্ন নারীর নিকট গমনাগমন করে, আমরাও সেইরূপ ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়াই, এ তুলনাটা ঠিক নয়। আমাদের ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ানো, আর বহুনারীভোগীপুরুষে অনেক তফাত। বহু নারীগামী পুরুষদের চরিত্রের ওটা একটা বৈশিষ্ট্য। তাদেব আপনারা লম্পট আখ্যা দিয়ে থাকেন। কিন্তু তুলনা দিতে গিয়ে, আমাদের ফুলে ফুলে মধু খাওয়ার সঙ্গে তুলনাটা একান্তই ভ্রান্তিকর। মানুষ যেমন তণ্ডুলভোজী আমরা তেমনি মধুপায়ী। মধু খেয়েই আমরা জীবনধারণ করি। মানুষসহ, সব জীবের মধ্যেই প্রকৃতির কতকগুলি নিজস্ব করণীয় আছে। প্রকৃতির পরিচালনায়, আমরা বিভিন্নরূপে, জীবনধারণ করি। কেবল যে ফুলের পাপড়ির ভিতর মুখ ঢুকিয়ে, রেণুতে শুঁড় প্রবেশ করিয়ে মধুই পান করি, এটাই আমাদের একমাত্র কাজ নয়। প্রকৃতি আমাদের দিয়ে আরো একটি বিশেষ কাজ করিয়ে নেন। আমরা ফুলে ফুলে ঘুরি, আর পুরুষ ও রমণী ফুলের মধ্যে নিহিত বীজ ও ডিম্বকণার মিলন ঘটাই। তার ফলেই, ফুল থেকে ফল জন্মায়।

আমরা ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বাঁচি বটে, তার ফলস্বরূপ, আপনারা লাভ করেন ফল। ফুলেরও স্ত্রী পুরুষ আছে। কিন্তু প্রকৃতি তাদের চলে ফিরে উড়ে বেড়াবার ক্ষমতা দেন নি। অথচ তাদেরও মিলনের সময় আসে, তাদেরও ডিম্বাণু আর বীজ থাকে। আমরাই উভয়ের মধ্যে মিলন ঘটাই। তখনই রমণী পুষ্পটি গর্ভধারণ করে ফল প্রসব করে। ভাবছেন, তখন থেকে আপনাদের কেবল জ্ঞান দিয়ে যাচ্ছি। আসলে তা নয়। এই আত্মপরিচয়ের মধ্যে, আমি জীবনের একটা

ব্যাখ্যা দেবারও চেষ্টা করলাম। যা হয়তো আপনাদের কাজে না লাগতে পারে। গুণগুণ করা আমার স্বভাব, তাই একটু আত্মপরিচয়ের অবকাশে গুণগুণিয়ে নিলাম।

আপনাদের একটা ধারণা আছে, ভ্রমরের কোন হুল নেই। কেবল ঘরেতে ভ্রমর এলো গুণগুণিয়ে, আর নিদাঘ দ্বিপ্রহরের হাহাকারকে রমণী পুরুষের হৃদয় মধ্যে উদ্দীপ্ত করে তুলি। ওটা মানুষের মনেরই ব্যাপার। আমাদের কিছু করার নেই। আমার পাখার অতি দ্রুত তীব্র কম্পনের শব্দের মধ্যে আপনাদের অনুভূতি নানা ক্রিয়া করে। আমরা শান্তিপ্রিয় বটে, তবে আমাদেরও হুল আছে। সময় বিশেষে ফুটিয়েও থাকি। কথাটা আমি আগেই বলেছি।

এক লেখকের একটি বর্ণনা আমার এখনো মনে আছে। সাঁওতাল পরগণার একটি বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে, এক বিরহিনী কন্যা দুপুরে বিছানায় শুয়ে, দয়িতের জন্য গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল। এমন সময়ে, গুণগুণ করতে করতে, আমি সেখানে। বিরহিনী প্রিয়াটি চোখ ফিরিয়ে বারে বারে আমাকে দেখতে দেখতে, সহসাই তার মনে হলো আমি যদি তার রাঙা ঠোঁটে হুল ফুটিয়ে দিই? কথাটা ভেবেই, সে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল। আসলে, সে তখন তার প্রেমিকের চুম্বনই আকাঙ্ক্ষা করছিল। তার স্ফুরিত ওষ্ঠাধর তখন দংশিত হবার জন্যই ব্যাকুল। সেই কারণেই আমার হুল ফুটিয়ে দেবার আশংকার কথাটা তার মনে জেগেছিল। বর্ণনাটি আমার ভালো লেগেছিল। লেখকটির জানা ছিল, ভ্রমরের হুল আছে।

জানি, আপনারা মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। ভাবছেন, গুণগুণিয়ে কী শোনাতে চাও, সেই আসল কথাই শোনাও। তোমার প্রজাতির পাখা ও হুল বৃত্তান্ত আমাদের শোনবার সময় নেই। কথাটা মানি। আসলে এত সব কথার মূলে, আমার এই সামান্য পতঙ্গ জীবনের

বৃত্তান্ত বলার উদ্দেশ্য, এত যে কাব্য বর্ণনা, প্রতীক, এ সকলই তো ক্ষণিকের। আমি বরাবরই বলে এসেছি, জীবন প্রপঞ্চিত মায়াময়। বাস্তববাদীরা আমার কথায় ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসবেন। ভাববেন বা বলবেন, জীবন যদি প্রপঞ্চিত মায়াময়ই হয়, তবে জগত জুড়ে মানুষের এত উদ্যোগ আয়োজন অধ্যয়ন অনুশীলন, জীবনব্যাপী এত সৃষ্টি সাধনার কারণ কি? সবই কি মিথ্যা?

না, তা আমি বলতে চাই না। যেমন চাই না বলতে, জীবন অসার। তবু প্রপঞ্চিত মায়াময় এই কারণেই বলি, আপনারা কি ভাবেন, সভ্যতার ইতিহাস আপনারাই গড়ে তুলছেন। এর আগে কিছু ঘটে নি? তা বোধহয় বলতে পারেন না। এই সভ্যতার আগেও, আকাশচুম্বী সভ্যতা বীরত্ব নিয়ে মানুষ অনেক গৌরব করে গেছে। কিন্তু তার অবশিষ্ট কী আছে? কিছু চিহ্ন, কিছু ছেঁড়া পাতার ইতিহাস। যে মহাভারতে পুরুষকারের জয়গান, সেখানেও বলা হয়েছে, পুরুষকারের থেকেও বড় বিষয় হল মানুষের ভাগ্য। অন্তিম প্রয়াণে আমি অতি বলবীর্যশালী মহাতেজপ্রভঃ রাজা পাণ্ডুর কথা বলছি। সে সব বিষয়কে আমি ভ্রান্তিজনক বলব না। কিন্তু জীবন যে প্রপঞ্চিত মায়াময়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ আছে কি?

মিশরের সভ্যতাই বলুন, বা আজ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত ভাষা মহেন্‌জোদরোর সভ্যতার কথাই বলুন, বা মহারাজা জরাসন্ধের বিশাল সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য, হস্তিনানগর পাঞ্চাল, দ্বারকার বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠীর গৌরবজনক অধ্যায়, কোথায় গেল? অতি ধুরন্ধর তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজনীতিজ্ঞ এবং মহাবীর কৃষ্ণের মৃত্যুর কথা, কেউ কি কখনো ভাবতে পেরেছিলেন? সামান্য একজন ব্যাধের তীর বিদ্ধ হয়ে, তাঁর মতো মহাপুরুষকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। তাঁর কুললনাগণ কেবল যে তস্করদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়েছিল, তা নয়, তারা নিজেরাই যৌবনমদে মত্ত হয়ে কুলটাদের ন্যায় ব্যবহার করেছিল। যে-সব্যসাচীর হাতে

শত্রুকুল নিধন হয়েছিল, তিনিও যদুবংশের রমণীদের রক্ষা করতে পারেন নি। গাণ্ডীব ধারণে অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন।

এ সমস্তই আপনাদের জানা কথা। আমার বলার অপেক্ষা রাখে না। বলার অপেক্ষা রাখে শুধু, মানুষ ইতিহাসকে ভুলে থাকতে চায়। এই জগৎ সংসারের মায়া মোহকেই আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। সেটাই স্বাভাবিক। অন্যথায় প্রকৃতি তার কাজগুলো সাধন করবে কেমন করে। প্রকৃতির কাজ তো কেবল আমাদের এই সামান্য একটি গ্রহ পৃথিবীকে নিয়ে নয়; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এ রকম কোটি কোটি গ্রহ সর্বদাই ঘূর্ণিত হচ্ছে। প্রকৃতি সকল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তার আপন কাজ করে চলেছে। আজ যে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে মানুষের অভিযানের আয়োজন চলেছে, এমন কি, এই সেদিনেও দেখলাম, মাধ্যাকর্ষণের কক্ষ অতিক্রম করে, নরনারীর মিলন ও সন্তান জননের চেষ্টার উদ্যোগ চলছে এই সবই প্রকৃতিরই সহযোগিতায় ঘটছে। আপনারা হয়তো অনেকে বিশ্বাস করেন না, প্রকৃতি দিয়েই প্রকৃতিকে জয় করা যায়। প্রকৃতির বিরুদ্ধাচারণ করে, প্রকৃতিকে জয় করা যায় না। জয়ের জন্য যা কিছু আয়ুধ, সবই প্রকৃতিরই দান।

যাক এ সব কথা। আপনারা আবার আমার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠছেন। জীবনের কথা বলতে গেলেই, তার স্বরূপ বিষয়ে নানা কথা আমার মনে এসে যায়। একে দার্শনিকতা ভাববেন না, ভাববেন একটি পতঙ্গের চোখে দেখা জীবন কী আশ্চর্য রকম প্রপঞ্চিত মায়াময়।

চলুন, এবার আপনাদের নিয়ে, সাঁওতাল পরগণারই এক জমজমাট জেলা শহরে যাই। সাঁওতাল পরগণার জেলা শহরের সঙ্গে, কলকাতা বা তার আশেপাশের মিল খোঁজবার চেষ্টা করবেন না। এবং শহরের ছবিটা, লাল মাটি, গাছপালা, টিলা পাহাড় ও দূর তেপান্তরে ছড়ানো একটি সুন্দর শহর। এখানে কোর্ট কাছারি, ব্যাংক, সেচ বিভাগ থেকে

বিদ্যুতের দপ্তর, কারখানা, সরকারি নানান্ অফিসও পাবেন। প্রথম যে অঞ্চলটিকে নিয়ে শহর গড়ে উঠেছিল,দেখতেই পাচ্ছেন, সেই অঞ্চলটি সব থেকে ঘিঞ্জি। অনেকটা চকের মতো বাজার, বড় বড় দোকান, মাড়োয়ারিদের গদী, কী নেই ? ভারতবর্ষের যে কোন শহরে গেলেই, এ রকম একটি ঘিঞ্জি বাজার এলাকা আপনি দেখতে পাবেন।

শহরটি বিহার প্রদেশের অন্তর্গত হলেও, কলকাতা থেকে প্রতিদিনই একটি বাস যাতায়াত করে। ট্রেনেও আসতে পারেন, তবে স্টেশনটা শহর থেকে দূরে। বিহারের কয়েকটি বড় বড় শহরের সঙ্গেও এ জেলা শহরের বাস যোগাযোগ আছে। রাজধানী পাটনায় যে আছে, সেটা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু এই ঘিঞ্জি এলাকায় আমি আপনাদের টেনে আনব না। আপনাদের আমি নিয়ে যাব কিছুটা ফাঁকা অঞ্চলে, যেখানে গেলেই আপনি বুঝতে পারবেন, ক্রমবর্দ্ধমান শহরের এ অঞ্চলটিতে অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের বাস। অবস্থাপন্ন সকল ব্যক্তির রুচি থাকে কী না, সেটা নিয়ে আপাতত তর্ক না তুলেও বলা যায়, দেখতেই পাচ্ছেন, প্রতিটি বাড়িই সুরুচি-সম্পন্ন, আধুনিক। অধিকাংশ বাড়ির সামনেই বাগান, বড় গেট। কোন কোন বাড়ির পিছনেও বাগান রয়েছে। প্রায় প্রত্যেক বাড়িরই গ্যারেজ রয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন, গাড়িও রয়েছে অনেক বাড়ির গ্যারেজেই।

অবশ্য এ রকম নতুন গজিয়ে ওঠা, শহরের সীমান্তগুলিতে একটি নয়, আরো আছে নতুন আধুনিক পল্লী। স্বাভাবিক। যারা ব্যবসায়ী নয়, বা আগে থেকেই শহরের মধ্যস্থলে বাড়ি করেনি, পরবর্তীকালের অর্থবান ব্যক্তিরা, তাদের রুচি মতো, এ রকম ফাঁকা জায়গায় আসতে চায়। আমার মতো পতঙ্গরাও এ রকম জায়গাই ভালোবাসি।

আশে-পাশে শালবন, অনেক বাড়িতেই উক্যালিপটাস, দেবদারু জাতীয় গাছ রয়েছে। চোখ ফেরালেই, এদিক ওদিক পাহাড়ি টিলা দেখা যায়। রাঙামাটির পথ এ রকম শহরে পল্লী থেকে বেরিয়ে চলে গিয়েছে দূরান্তরের গ্রামে।

আপনারা যারা ভারতবর্ষের বড় শহরগুলিতে বাস করেন, তাদের কাছে এ শহরটাকে ছবির তুল্য মনে হবে। বাজারের ঘিঞ্জি এলাকা বাদ দিলে, যে-দিকে কোর্ট কাছারি, জেলখানা, ডি. এম, এ. ডি.এম, ডি. এস. পি, এস. ডি ও, ইত্যাদি সাহেবদের কোয়ার্টার বা যেদিকে হাসপাতাল, রাজেন্দ্র ভবন ইত্যাদি রয়েছে, সে সব অঞ্চলও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, আর সবখানেই গাছপালা আছে। রাজেন্দ্র ভবন হল প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের নামে। স্থানীয় বাঙালীরা একটি রবীন্দ্রভবনও করেছেন। আর কালীবাড়ি? তাও পাবেন। বাঙালীরা যেখানেই যান, সেখানেই একটি কালীবাড়ি চাই।

সাঁওতাল পরগণা যখন, তখন বুঝতেই পারছেন, পশ্চিম বাঙলার সীমান্তেই। দীর্ঘকাল ধরে এ সব অঞ্চলে বাঙ্গালীরা যে কেবল বায়ু বদল করতে এসেছেন, আর সেই কারণেই একটি করে বাড়ি করেছেন, তা নয়। সে সব দিনকাল অনেক দিন গত হয়েছে। এখন অনেক কিছুই বদলে গেছে। সে সব বাঙালীরা তো আছেনই। তারপরেও কাজের উপলক্ষে, বাঙালীর সংখ্যা এ শহরে খুব কম নয়। রাজনীতির কূট চালে কখনো কখনো বাঙালী অবাঙালী বিরোধের একটা ইচ্ছাকৃত তৈরি অবস্থার সৃষ্টি করা হয়। অন্যথায় বাঙালীর সংখ্যা এখানে কম নয়, আর তারা ভালোই আছেন। সাধারণ ভাবে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কও ভালো।

তবে আপনারা তো আমার থেকে কম জানেন না, রাজনীতি হচ্ছে একটা বিষাক্ত ধূমায়িত অগ্নিকুণ্ডের মতো। এর অবস্থান অজগরের

মতো মাটির তলায়। যে কোন কারণেই, প্রয়োজনে এই অগ্নিকুণ্ডটি খুঁচিয়ে এক শ্রেণীর লোক ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে নিজেদের কিছু লাভ তুলে নেয়। কল কারখানা থাকলে রাজনীতিওয়ালাদের সুবিধা বেশি হয়। সৌভাগ্যের বিষয়, দু-একটি ছোটখাট কারখানা বাদ দিলে, এ শহর সেদিক থেকেও আপনাকে আকর্ষণ করবে। তবে আধুনিক অটোমোবিলের যুগে, পলিউশন কোথায় নেই। পলিউটেড আবহাওয়ার জন্য, পানীয় জল থেকে নিশ্বাসের বায়ু সর্বত্রই বিষাক্ত হয়ে উঠছে। সেই হিসাবে, এ শহরও তা থেকে মুক্ত নয়।

এই তো দেখুন, সকাল এখন সাড়ে ন'টা। শহরের সর্বত্র চলমান অটোমোবিলের গর্জন। শুধু মোটরগাড়ি বাস ট্রাক লরি তো নয়। আজকাল বাড়িতে বাড়িতে মোটরবাইক, স্কুটার। একেই বলে যুগের হাওয়া।

আসুন। সামনের যে-বাড়িটা দেখছেন, দোতলা, উক্যালিপটাস ঘেরা, সামনে বাগান, গ্যারেজে গাড়ি, এ বাড়ির অন্দরমহলেই আগে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি। এ বাড়ি যিনি তৈরি করেছিলেন, সে মথুরামোহন মিত্র মারা গেছেন। এই বাড়িটা তিনি প্রথম করেননি। যে-বাড়িটা প্রথম করেছিলেন, সেই বাড়ি এখন শহরের মধ্যস্থলে। অবশ্য তখন শহরের মধ্যস্থল, আজকের চকের মতো হয়ে ওঠেনি। মথুরামোহন সামান্য একজন উকীল থেকে, জীবনের শেষে জজ হয়েছিলেন। তাঁর একমাত্র পুত্র, সেও এখন এ শহরের বিশিষ্ট একজন আইনজীবি। চার কন্যার বিয়ে দিয়েছেন।

মথুরামোহনের পুত্র মধুসূদন বিবাহিত। বয়স অনধিক চল্লিশ। অনধিক বললে, ভুল বলা হয়। আপনারা নিজেরাই তো দেখতে পাচ্ছেন, মধুসূদন বাইরের ঘর, বা কনসাল্টেশন কাম অফিস রুম, যা-ই বলুন, সেখান থেকে বাড়ির দোতলায় উঠছে। ইতিমধ্যেই ওর স্নান

খাওয়া শেষ, কোর্টে যাওয়ার পোশাকও পরেছে। দেখলেই বোঝা যায়, তার বয়স এখন ছত্রিশ সাঁইত্রিশের বেশি নয়। ওর দীর্ঘকান্তি, মেদবর্জিত, আর বাঙালায় আপনারা যাকে চিকন শ্যামল রঙ বলেন, সেই সব মিলিয়ে ওর চেহারার মধ্যে কি একটি মেয়েলি ছাপ দেখতে পাচ্ছেন ? ওর ঘন কৃষ্ণ কুঞ্চিত, বাঁদিকে সিঁথি কাটা চুল। চোখে পড়বার মতো চওড়া কপাল আদৌ নয়, নয় খড়্গ নাসাও, বরং টিকলো নাক, পাতলা ঠোঁট, সরু কালো ভুরু। গোঁফ দাড়ি কামানো, এবং সব থেকে লক্ষণীয় ওর কৃষ্ণপুচ্ছ বড় বড় চোখ, এ সবই ওর মুখে ফুটিয়ে তুলেছে একটা কোমলতা।

মধুসূদন আসলে ওর মায়ের মতো দেখতে। আমাদের পতঙ্গ জাতির মধ্যে যে সব প্রবাদ বা বিশ্বাস মোটেই প্রচলিত নেই, আপনাদের আছে। আপনাদের বিশেষ করে বাঙালীদেরই বলতে শুনি, মাতৃমুখী পুত্র সন্তান আর পিতৃমুখী কন্যা সন্তান নাকি সুখী হয়। আমাদের পতঙ্গকুলে এ রকম কোন বিশ্বাস প্রচলিত না থাকলেও, এ রকম ভাববেন না যে, আমাদের সবাইকে দেখতে বুঝি এক রকম। যেমন আপনারা অনেক সময় চীনা বা জাপানীদের দেখে বলে থাকেন একজনের চেহারার সঙ্গে, আর একজনের চেহারা আলাদা করতে পারেন না, হয়তো আমাদের ক্ষেত্রেও, আপনাদের সেই রকমই ধন্দ লাগে। আসলে, আমরা কিন্তু আমাদের প্রত্যেককে আলাদা করে চিনতে পারি। অবশ্য আপনাদের এক কবি তাঁর গানে বলেছেন, 'ফুলের বনে যার সাথে যাই/ তারেই লাগে ভালো। ও রজনীগন্ধা তোমার গন্ধসুধা ঢালো।' ··এর মধ্যে হয়তো আমাদের পতঙ্গকুলকে কিছুটা প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করতে চাওয়া হয়েছে। আপনারা মানবজাতির কবি সাহিত্যিকরা, প্রতীকের ক্ষেত্রে অনেক কিছুই লিখে বা বলে থাকেন। আসলে কিন্তু, ফুলের বনে যার কাছে যাই, তারেই লাগে ভালো, এ কথাটা আমাদের বেলায় সব সময় খাটে না। আমাদের মধ্যে পরস্পরকে চেনাচিনি আছে। ফুলের বনে যার

কাছে যাব, তাকেই ভালো লাগতে পারে, তবে ভাব জমানো কঠিন। জেনে রাখুন দ্বন্দযুদ্ধটা আমাদের মধ্যেও আছে। আসল প্রসঙ্গ ছেড়ে এসে আপনাদের বিরক্তি উৎপাদন করছি হয়তো। চলুন, মধুসূদনের প্রসঙ্গেই ফিরে যাই। কথা হচ্ছিল, মাতৃমুখী পুত্র সন্তান নাকি সুখী হয়। এটা আপনাদের বিশ্বাস। কেন এ রকম বিশ্বাস, তা জানি না। অতীতের যত মহাকাব্যের নায়ক, তাদের সম্পর্কে মহাকবিরা সে রকম কিছু লিখে যাননি। যেমন ধরুন কৃষ্ণ বা অর্জুন। শেষ জীবনে যা-ই ঘটে থাক, প্রথম জীবনে এঁরা তো সুখীই ছিলেন। কিন্তু এঁরা কেউ মাতৃমুখী সন্তান ছিলেন কী না, তা কোথাও বিবৃত হয়নি

মধুসূদনকে আপাততঃ সুখীই বলা যায়। কিন্তু শেষ মন্তব্য করা খুবই কঠিন। যে কারণে আমি জীবনকে প্রপঞ্চিত মায়াময় বলেছি। অতএব ও সব প্রবাদ বিশ্বাসের কথা এখন থাক। মধুসূদনকেই দেখুন। আপনারা যাকে বলেন, হ্যাণ্ডসাম্ আর স্মার্ট, মধুসূদনকে সেই রকমই দেখাচ্ছে নাকি? শাদা টেরিকটের ট্রাউজার, শাদা ফুল স্লিভ শার্ট, গলায় চওড়া কালো নেকটাই, পায়ে ব্রাউন রঙের জুতো, এ সবে ও নিজেই শুধু ঝকমকিয়ে নেই, যেন সিঁড়ি পথটাকেও উজ্জ্বল করে তুলেছে। শার্টের স্টিফ কলারের ঝকমকে মাজা মসৃণতা দেখেই বুঝতে পারছেন, একজন আইনজীবি হিসাবে, ও পোশাক-আশাক সম্পর্কে যথেষ্ট সজ্ঞান। কলকাতার লোকের কাছে হয়তো এটা তেমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মনে হবে না। সেখানে আপনারা হাইকোর্ট থেকে শুরু করে, জাজেস কোর্টে, অনেক ব্যারিস্টার বার-এ্যাট্-ল-দের ঝলকানো পোশাকে ছুটোছুটি করতে দেখে থাকেন। সেদিক থেকে বিচার করলে, সীমান্তের জেলা শহরের একজন আইনজীবি মধুসূদন মিত্রকে আপনারা মোটেই গাঁইয়া আর দেহাতী একজন উকীল বলতে পারবেন না। সবকিছু মিলিয়ে, কলকাতার পোশাকের কেতা থেকেও কিছু কম যায় না। আসলে, পাটনা হাইকোর্টেই ওর আইনজীবি হিসাবে আইনের ব্যবসা করার কথা ছিল। ওর নিজের মনোমত

ইচ্ছাও ছিল তাই। সে-বিষয়ে ওর বাবা মথুরামোহনই আপত্তি করেছিলেন।

কিন্তু সে-সব প্রসঙ্গ পরেও আসবে। একটা কথা বলি, ভাববেন না, কোর্টে বেরোবার আগে, মধুসুদন দোতলায় খেতে চলেছে। একটু আগেই ও আহারাদি নীচের খাবার ঘরে সেরে নিয়েছে। এ বাড়ির খাবার ঘর নীচেই।

বাড়িটার চেহারা আপনারা আগেই দেখেছেন। আমি হয়তো আপনাদের চোখে আঙুল দিয়ে বাগানের এক পাশে গেস্টহাউসটি দেখাইনি। গ্যারেজের বিপরীত দিকেই, গেট দিয়ে ঢোকবার দক্ষিণেই ছোট একটি একতলা অতিথি ভবনও আছে। ছোট খাটো একটি বাংলো বলতে পারেন। আউট হাউস বা চণ্ডীমণ্ডপ বা কাছারি ঘর-টর ভাববেন না। রীতিমত দুটি সাজানো শোবার ঘর, সংলগ্ন বাথরুম, দু'পাশে ইংরেজী এল অক্ষরের মতো বারান্দা। তার সামনেই রয়েচে গাড়ি পার্কের জায়গা। এই মুহূর্তে সেখানে একটি গাড়ি রয়েছে।

গোটা গৃহটির এই চেহারার বর্ণনা দেবার কারণ আর কিছু নয়, একবার ভেবে দেখুন, এতবড় বাড়িটার মধ্যে, গৃহের অধিবাসী ক'জন. মধুসূদন, তার স্ত্রী, মধুসূদনের বিধবা মা, আর বড়দিদির ছোট মেয়ে লীনা, গৃহের আসল বাসিন্দা বলতে এই কয়েকজন। আর একজনকেও প্রায় এই গৃহের অধিবাসীই বলা চলে। তিনি হলেন জগদীশ মোদক। মথুরামোহন মিত্রের মুহুরি ছিলেন তিনি। অল্প বয়সে ভাগ্যান্বেষী হয়ে পশ্চিম বাংলার প্রান্তে, এই প্রদেশের জেলা শহরে এসেছিলেন। মথুরামোহনের বয়সও তখন অল্প, এবং তিনি তখন সবে মাত্র একজন বিজ্ঞ আইনজীবি হিসাবে নাম করতে শুরু করেছেন। জগদীশবাবুর সঙ্গে তখন থেকেই তাঁর যোগাযোগ। মথুরামোহনের ইচ্ছা থাকলেও

জগদীশবাবু কখনো বিয়ে করেননি। অতএব, মথুরামোহনের জীবিতকাল থেকেই, জগদীশবাবু এই পরিবারেরই একজন হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর জীবনে চাইবার কিছুই ছিল না। শেষ জীবনটা কোন রকমে একটা আশ্রয়ে কাটিয়ে যাওয়া।

মধুসূদনকে ওর বাবাই জগদীশবাবুর দায়িত্ব দিয়ে গেছলেন। এখন জগদীশবাবু এই বাড়িরই নীচের তলায় একটি ঘরে থাকেন। যাকে বলে পুরোপুরি রিটায়র্ড লাইফ, তাঁরও তাই। মধুসূদন ওর নিজের কাজের জন্য আলাদা ক্লার্ক মুহুরি রেখেছেন। এ্যাসিস্ট্যান্ট ল-ইয়ারও আছে। কারণ ওর একলার পক্ষে সমস্ত কিছু সামলে ওঠা সম্ভব নয়।

এই বিরাট বাগান, বাড়ি, অতিথি ভবন, সব মিলিয়ে, এই ক'জন অধিবাসী ছাড়া, বাকি সবাই ভৃত্য আর দাসী পর্যায়ে পড়ে। রান্নার জন্য এক জন পাঁড়েজী আছে। সৌভাগ্যবশত সে নিরামিষাশী নয়। মছলি পর্যন্ত তার চলে। কিন্তু মাংস হলেই গোলমাল। সেজন্য একজন বাঙালী পাচক আছে। তার মধ্যে অবশ্য কথা আছে। প্রয়োজনে রান্নাঘরে স্বয়ং মধুসূদনের স্ত্রী অমৃতাকেও ঢুকতে হয়। তবে অমৃতাকে তখনই ঢুকতে হয়, যখন বিশেষ কোন খাদ্য প্রস্তুতের প্রয়োজন পড়ে, অথবা নিতান্তই শখ করে, নিজের হাতের রান্না স্বামীকে খাওয়াবার জন্য ঢোকে। যদিও, সংসারের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা অমৃতার হাতেই। তা বিধবা শাশুড়ির সেবা থেকে, রান্নাবান্না, এমন কি, প্রয়োজন হলে, মধুসূদনের ফাইল পত্রও ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়। তবে সেটা নিতান্তই আকস্মিক ব্যাপার।

মধুসূদনের বড়দির ছোট মেয়ে লীনার বয়স এখন দশ। আশা করি, আপনাদের অতঃপরেও বুঝিয়ে বলার দরকার নেই, মধুসূদন ও অমৃতার কোন সন্তান নেই। থাকলে এ বাড়ির চেহারা হয়তো অন্য রকম হত। লীনাকে সেই কারণেই যে কেবল এ বাড়িতে এনে রাখা

হয়েছে, তা নয়। লীনা ওর মামা মামীর বিশেষ প্রিয়, ও নিজেও মামা মামীকে ভালোবাসে, তাদের কাছে থাকতে চায়। সেদিক থেকে লীনা এবাড়ির শূন্যতাকে কিছুটা পূর্ণ করতে পেরেছে।

মধুসূদন সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই, চলুন আমরা আগেই দোতলার অমৃতার ঘরে যাই। এ বাড়ির একতলা থেকে দোতলায় এলেই মনে হয় যেন অন্য এক জগতে চলে এসেছি। পূর্বদিকে তাকালে প্রথমেই চোখে পড়ে অগভীর শালবন। বীরভূমের তথাকথিত খোয়াই অঞ্চলের মতো নয়। কিন্তু উঁচু নীচু, আর লাল মাটির মাঝখান দিয়ে, শালবনের ছায়ায় ছায়ায়, অনেকগুলি আঁকাবাঁকা হাঁটা পথ চলে গেছে। কেবল পায়ে চলা পথই নয়, কোন কোনটায় গরুর গাড়ির চাকার দাগ, এঁকেবেঁকে চলে গেছে সমান্তরাল রেখায়। পথগুলি চলে গিয়েছে বিভিন্ন বস্তি আর গ্রামাঞ্চলে।

দোতলার উত্তর দিক ছাড়া, বাকি তিনদিকেই বারান্দা। পশ্চিমের বারান্দায় গেলে চোখে পড়ে প্রায় একই চিত্র, কিন্তু তার সঙ্গে, কাছে ও দূরে কিছু টিলা ও পাহাড়ের শীর্ষদেশ। দক্ষিণ দিকে কোর্ট, আর সরকারি এলাকা। উত্তর দিকটার কিছুটা অংশ পাথর ছড়ানো, তারপরে একটি অজগরের মতো পাকানো নদী। নদীর ওপারেই জঙ্গল এবং বস্তি। তবে নদীর কাছাকাছি পর্যন্ত ইতিমধ্যেই নতুন কিছু আধুনিক ইমারত উঠতে আরম্ভ করেছে বা উঠে গেছে।

দোতলায় সব শুদ্ধ ছয়টি ঘর। ছয়টি ঘরই শোবার। আবার কোন আলাদা পরিবার থাকলে, ড্রয়িং, ডাইনিং রুম ছাড়াও, একটি ছোট ঘর আছে, যেটিকে রান্নাঘর হিসাবে ব্যবহার করা যায়। সেই ঘরটিকে ধরলে, দোতলায় সাতটি ঘর আছে। তিনতলায় ছাদে ওঠবার সিঁড়ি আছে। সেখানে চিলেকোঠাটি বেশ বড়। চিলেকোঠায় নারায়ণ শিলা রাখা আছে। এবং প্রত্যহই একজন মৈথিলী ব্রাহ্মণ নারায়ণের

নিত্য পূজা করে। মধুসূদনের মা সকাল দশটা অবধি প্রায় সেখানেই থাকেন। তারপরে নামেন।

দোতলায় এখন সব ঘরের দরজা খোলা। এটা অমৃতার নির্দেশ। ব্যবহৃত না হলেও, প্রতিটি ঘরই, প্রত্যেক দিন সকালে ঝাড়া পোছা ঝাঁট দেওয়া হবে। কারণ প্রতিটি ঘরেই খাট বিছানা পাতা রয়েছে। অর্থাৎ থাকবার মতো উপযোগী আসবাবপত্র সব ঘরেই রয়েছে। অতএব পরিষ্কার না করা মানেই, ঘরগুলোর অযত্ন ও ক্ষতি সাধন করা। বিশেষ করে, লোকের যখন অভাব নেই।

দোতলায় উঠে, বাঁদিকে মোড় নিয়ে পূর্বদিকে মুখ করা প্রথম ঘরটিই অমৃতার। বা বলতে পারেন মধুসূদনের। মাঝে একটি ঘর বাদ রাখা হয়েছে। সেই ঘরটিকে অমৃতা প্রায় ওর নিজের একটি পড়া-শোনা বসবার ঘর করে নিয়েছে। তার পরের ঘরটিতেই থাকেন মধুসূদনের মা এবং লীনা।

অমৃতা এই মুহূর্তে ওর পড়ার ঘরের পাশের ঘরের মাঝখানের ভেজানো দরজার কাছে এগিয়ে, গলা তুলে জিজ্ঞেস করল, 'কী হল লীনা, তোমার আর কত দেরি?' ভিতর থেকে বালিকা কণ্ঠে জবাব এলো 'হয়ে এসেছে মামীমা।'

অমৃতা বলল, 'তুমি জামা পরে, একেবারে বই নিয়ে নীচে খেতে নামবে।'

ভিতর থেকে আবার জবাব এলো, 'আচ্ছা।'

আসলে অমৃতাও মাত্র দশ মিনিট আগেই ওপরে এসেছে। মধুসূদনের খাবার সময় ও নীচেই ছিল। মধুসূদন যখন ওর নীচের জোড়া অফিস-কাম-কনসাল্টেশন রুম থেকে বেরিয়ে ওপরে স্নান সেরে পোশাক পরতে আসে, অমৃতা সেই সময়ে নীচে ওর খাবার তদারকিতে ব্যস্ত

থাকে। মধুসূদনের খাওয়া হয়ে গেলেই, অমৃতা দ্রুত একবার ওপরে আসে। এটা ওর প্রাত্যহিক কাজ। ওপরের ঘর কী রকম পরিষ্কার হচ্ছে না হচ্ছে, সেটা ও নিজের চোখে দেখে নেয়। লীনাকেও তাড়া দিতে হয় রোজই। তারপরে ও নিজে শাড়ি জামা কাপড় বদলে, সামান্য সেজেগুজে নেয়। কারণ, মধুসূদনের সঙ্গে একই গাড়িতে ও কোর্টে যায়। ড্রাইভার একজন মাইনে করা আছে। কিন্তু মধুসূদন নিজেই গাড়ী ড্রাইভ করে কোর্টে যায়। সঙ্গে থাকে অমৃতা আর লীনা। মধুসূদন কোর্টে নেমে গেলে, অমৃতা নিজেই স্টিয়ারিংয়ে এসে বসে। ড্রাইভিংটা ও ভালোই জানে। আর এই জেলা শহরে, সেই জন্যই ও বিশেষ ভাবে সকলের কাছে পরিচিতা

অমৃতা কোর্ট থেকে বেরিয়ে, শহরের অন্য প্রান্তে মিশনারী ইস্কুলে লীনাকে পৌঁছে দিয়ে, রোজই একবার শহরের কেন্দ্রস্থল চকের দিকে যায়। কিছু না কিছু কেনা-কাটা করেই। সময় বিশেষে কাঁচা বাজারও করে। তারপরে বাড়ি ফেরে।

অমৃতার ঘর দরজা পরিষ্কার করার তদারকি হয়ে গেছে। লীনাকে তাড়া দেওয়াও শেষ। এবার ওর নিজের জামা কাপড় বদলানো। সেটাও কি আপনারা আমার সঙ্গেই দেখবেন ? আপাতত সে সুযোগটা পাচ্ছেন না। তবে, আমার চোখ দিয়েই দেখুন। তার আগেই দেখে নিন, অমৃতার চেহারাটি।

আপনারা তো আজকাল আর সংস্কৃত সাহিত্যের নায়িকাদের বর্ণনা রীতি-ভঙ্গি পছন্দ করেন না। এখন আপনারা টল্ বা স্লিম বা শর্ট ফিগার বলতে চান। বাস্ট আর হিপকে সমান ভাবে ভাগ করতে না চাইলেও, বাস্টের থেকে হিপ সামান্য স্থূল হলেই আপনাদের পছন্দ। এক্ষেত্রে সুনিতম্বিনী বিশেষণটি হয়তো আপনাদের ভালো লাগবে না। লাগলেও, ইংরেজি পড়ে, আর এক শ্রেণীর বাতিকগ্রস্ত

তথাকথিত সংস্কৃতিবান ভদ্রলোকদের দৌরাত্ম্যে, নিতম্ব বা স্তন শব্দ বাঙলা সাহিত্য থেকে বাদ দিতে পারলেই বোধহয় ভালো হয়। নিতম্বকে হিপ বা বাট্যাক বললেই শুচিবায়ুগ্রস্ত তথাকথিত বাঙালী সংস্কৃতিবানরা খুশি হন। তবে কী দিয়েই বা উক্ত ভদ্রলোকদের মান রাখবেন। স্তন না বলে ব্রেস্ট বললেও তাদের কানে কেমন কেমন লাগতে পারে। একমাত্র বক্ষস্থল বলে যদি চালিয়ে দিতে পারেন, তাহলে এক রকম চলে যেতে পারে।

কিন্তু নারীর বক্ষ, যা পৃথিবীকে চিরকাল মোহিত করে এসেছে, তাকে নিতান্তই বক্ষস্থল বললে, অন্তত আমার মতো পতঙ্গেরও যেন মনটা বিমর্ষ হয়ে যায়। পীনপয়োধরা তো আজকাল নেহাতই প্রাচীন হয়ে গেছে। আজকালকার শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা হয়তো তাড়াতাড়ি অভিধান নিয়ে, পীনপয়োধরা বা পীনবক্ষের মানে খুঁজতে বসবে। কিন্তু হেভি চার্মিং বাস্ট বললে, তাকে আর মানে খুঁজতে হবে না, সে তৎক্ষণাৎ বুঝে যাবে। ভদ্রলোকদেরও মান বাঁচবে। যাক, তবু কথাটা ইংরেজিতে বলা হয়েছে তো! বাঙলায় না বললেই হল।

ইংরেজিতে চার অক্ষরের শব্দগুলি পড়তে আপনাদের বেশ ভালোই লাগে। এমন কি, ইংরেজিতে গালাগালও ভালো লাগে। কিন্তু বাঙলায় বললেই মুশকিল। এতে ইংরেজি ভাষা সৌভাগ্যশালিনী হয় না, পোড়া কপাল বাঙালীর। সে তার ভাষায় নিজের যাবতীয় বিষয়কে প্রকাশ করতে অক্ষম।

অমৃতাকে দেখে, আপনাদের দৃষ্টির মুগ্ধতা লক্ষ্য করছি। অতঃপর এই রমণীরত্নের বর্ণনার হয়তো প্রয়োজন নেই। তবু, আমি সে লোভটা একেবারে সংবরণ করতে পারছি না। অমৃতাকে দেখে, আপনারা ওর বয়স কত অনুমান করছেন? আপনাদের চাহনি দেখেই বলে দিতে পারি, পঁচিশের বেশি কেউ ভাবছেন না। ভাবাটা খুবই

স্বাভাবিক। হয়তো কেউ কেউ আরও কম ভাবতে পারেন। কারণ শুধু দেহের নিটুট গঠন নয়, ওর সমস্ত চেহারার মধ্যেই এখনো যেন একটি টীন-এজারের ছাপ রয়েছে। তা বলে নিতান্ত কিশোরী বলে চালাতে চাই না। তবে ইচ্ছা করলে, অমৃতা নিজেকে অনায়াসে কুড়ি একুশ বলে চালিয়ে দিতে পারে। আসলে ওর বয়স আটাশ পেরিয়ে উনত্রিশ চলছে। বয়সটা বলে দিয়ে, আপনাদের বোধহয় খুবই হতাশ করলাম। এই জন্যই বলে, মেয়েদের বয়সের কথা জিজ্ঞেস করতে নেই। নারী, নারীই। তার আবার বয়সের দরকার কী? একমাত্র দরকার, প্রথম দর্শনেই সেই নারী তার রূপ যৌবন নিয়ে কতটা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হল।

কিন্তু আপনাদের কাছে আমার একটা সততার প্রশ্ন আছে। আপনাদের যেখানে যাদের কাছে নিয়ে যাব, তাদের সম্পর্কে যেমন কোন কিছু গোপন রাখব না, তেমনি আপনাদের সমস্ত বিভ্রান্তিকে আমি অকপটে দূর করব। অমৃতার বয়সটা প্রকাশ করলেও, আশা করি আপনাদের মুগ্ধতা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি।

শিখরদশনা শব্দটি আপনাদের কেমন লাগে? তন্বী শ্যামা শিখরদশনা, এ সব বর্ণনা দিয়ে বহুকাল আগেই কালিদাস আপনাদের মন জয় করে গেছেন। আমার মনে হয়, আজও সে সব বর্ণনাই, নানা ভাবে ও ভাষায় ঘুরে ফিরে আসে। যে যতই মডার্ণ হন আর ভাষা ব্যবহার করুন, আসলে সংস্কৃত সাহিত্যকে ছাপিয়ে কেউ উঠতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

শিখরদশনা বলতে কি কেবল অতি উত্তমা রমণী বোঝায়? শিখরের সঙ্গে পর্বতশৃঙ্গের তুলনা চলে। শিখরদশনা রমণীর উদ্ধত স্তনচূড়ার সঙ্গে মিলিয়েই কি শিখরদশনা বলা হয়েছে? এ বিষয়ে আমি যথার্থ কিছু বলতে না পারলেও, অমৃতার শরীরের বর্ণনা দিতে গিয়ে, ওকে

শিখরদশনা বললেও, ওর বুককে আমি ঠিক উদ্ধত বলতে পারি না। বরং ঈষৎ নম্রতার মধ্যেও যে লাবণ্যের একটা উদ্ধতা থাকে, ওর বুকের বর্ণনা দিতে গেলে, সে কথাই বলতে হয়। শ্যামা বললেই, আমরা অনেক সময় রঙের ঠিক অর্থটা ঘুলিয়ে ফেলি। কৃষ্ণ এবং কালীকে আপনারা শ্যাম ও শ্যামা বলে থাকেন। অথচ যথার্থ অর্থে, কৃষ্ণ ও কালী বলতে কালোই বোঝায়। যেমন শ্যাম চিকন বলতে আমরা কচি পাতাকে বুঝি। গাছে যখন নতুন পাতা গজায়, তার রঙ সবুজ নয়। কালোও নয়। সেই রঙের বর্ণনা দেওয়া, আক্ষরিক ভাবে অনেকটাই অসম্ভব। যেমন ধরুন রবীন্দ্রনাথকে নাকি তাঁদের পরিবারে শ্যামবর্ণ বলা হত। অথচ রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা তো তাঁকে গৌরবর্ণই বলেছেন।

আপনারা ভাবছেন এত কথার দরকার কী? পরিষ্কারই তো দেখতে পাচ্ছি, অমৃতা ফর্সা। ঠিকই, এ বিষয়ে আমিও আপনাদের সঙ্গে একমত। তবে কেবল ফর্সা বললেই, একটি মেয়ের দেহের রঙের সব কিছু বলা হয় না। আপনাদের মনে হচ্ছে না কি, ও তথাকথিত উজ্জ্বল গৌরী না হলেও, কেমন একটা সুবর্ণের ছটা যেন আছে? সুবর্ণ বললেই তৎক্ষণাৎ একেবারে সোনালী ধরে নেবেন না। কাঁচা সোনায় যেমন একটা চাপা আভা আছে, অমৃতার শরীরের রঙ অনেকটাই সেই রকম।

অমৃতার ঠোঁটে যে রঙ লাগানো নেই, তা তো দেখতে পাচ্ছেন। তবু লক্ষণীয় ভাবেই ওর ঠোঁট দুটির স্বাভাবিক রঙ লাল। পাতলা মোটেই বলা যাবে না, বরং কিঞ্চিৎ পুরু। অনেকে পাতলা রেখায়িত ঠোঁটের পক্ষপাতী। না, ভুল ফোটাবার কথা ভেবে বলছি না। প্রস্ফুটিত ফুলের কথাই আমার মনে পড়ছে। আপনারা মানুষ, মানবীয় কথা আপনারাই ভালো বুঝবেন। একটা ছোট তুলনা দিই। এ দেশের প্রাচীনকালের ভাস্করেরা মন্দিরের গায়ে যত নারী মূর্তি

পাথরে খোদাই করেছে, তাদের কারোরই ঠোঁট পাতলা রেখায়িত নয়। অমৃতার ঠোঁট দুটি সেই মন্দিরের নারী মূর্তির মতই। ওকে হঠাৎ দেখলে, ছিপছিপে লম্বা মনে হতে পারে। ছিপছিপে অনেকটা বলা যায়, কিন্তু হঠাৎ যতটা লম্বা ওকে মনে হয়, ততটা লম্বা নয়। মেদ যে ওর শরীরে এখনো ঠাঁই নিতে পারেনি, দেখেই বুঝতে পারছেন। আগেই বলেছি, বয়সের তুলনায় ওর মুখে এখনো যেন একটি কিশোরীর ছাপ রয়ে গেছে। অথচ ওর কালো টানা ভুরু জোড়ার নীচে, আরও কালো চোখ দুটিতে বুদ্ধির দীপ্তি রয়েছে। রয়েছে এমন একটি মগ্নতা, যা অনেকটা গাম্ভীর্যের মতো দেখায়। ওর নাক টিকলো। অর্থাৎ খুব চোখা না, আবার বোঁচাও না। এ সব মিলিয়ে ওর সারা মুখে যেমন একটি রূপের ঝলক আছে, তেমনি আছে একটা স্নিগ্ধতা। লাবণ্য কেবল ওর শরীরে নয়, মুখেও। সু-নিতম্বিনী ওকে বলতেই হবে। বরং বুকের যে তুলনাটা আমি দিতে চাইনি, ওর নিতম্বের ক্ষেত্রে সেটা দেওয়া যায়। ক্ষীণ কটি এবং তার নিচেই নিতম্বকে বিশালই মনে হয়।

অমৃতার মাথার চুল, ঘাড়ের কয়েক ইঞ্চি নীচে, সমান ভাবে ছাঁটা। শুধু চুলের জন্যই নয়, ওর চেহারার মধ্যে একটা আধুনিকতার ছাপও আছে। আসলে, এ এমন একটি বাড়ির বউ, যেখানে জা বা ননদ নেই, যারা চুল বেঁধে দেবে। নিজের হাতে রোজ রোজ চুল বাঁধতে ইচ্ছে করে না। তবুও মাঝে মাঝে, ওর এই চুলেই বিনুনি বাঁধে।

অমৃতা দরজা বন্ধ করে দিল। আপনাদেরও দরজার বাইরেই আপাতত থাকতে হবে। ও পোশাক বদলাবে।

মধুসূদন অমৃতার দরজায় এসে দাঁড়াল। বন্ধ দরজার দিকে এক পলক তাকিয়ে, হাত তুলে আস্তে আঙুল দিয়ে ঠুকল। ভিতর থেকে অমৃতার জিজ্ঞাসা ভেসে এলো. 'কে?

মধুসূদন বলল, 'আমি, মধু।'

বন্ধ দরজার ঘরের ভিতর থেকে ব্যস্ত জিজ্ঞাসা ভেসে এলো, 'আমার দেরি হয়ে গেল নাকি?'

মধুসূদনও ব্যস্ত ভাবেই বলল, 'না না, তোমার মোটেই দেরি হয় নি। আমাদের বেরোবার মতো সময় এখনো অনেকটাই আছে। তুমি কি তৈরি হচ্ছ?'

মধুসূদনের কথার জবাবে, অমৃতা দরজা খুলে সামনে দাঁড়াল। শাড়ির জমিটা ঠিক শাদা নয়, নতুন কোরা রঙ, লাল পাড়। তাঁতের শাড়িটির আঁচল বুকের ওপর দিয়ে টেনে দিতে দিতে, মধুসূদনের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। বলল, 'আমার হয়ে গেছে। আর এক মিনিট। কপালে একটা টিপ পরব। আমি তো এখনই নীচে নামছিলাম। ওদিকে লীনারও হয়ে গেছে।'

অমৃতাকে লালপাড় শাড়িটিতে কেমন মানিয়েছে, সে প্রসঙ্গ এখন থাক। আপনাদের মুগ্ধ চোখ দেখেই বুঝতে পারছি। অথচ দেখুন, ও ঠোঁটে রঙ লাগায়নি, চোখে কাজল মাখেনি। তবু লাল জামার সঙ্গে, কোরা রঙ লাল পাড় শাড়িতেই, যেন ওকে বিশেষ ভাবে সজ্জিতা মনে হচ্ছে।

মধুসূদনকে যেন কেমন আড়ষ্ট দেখাচ্ছে। ওর ঠোঁটের হাসিতেও যেন আড়ষ্টতা। বলল, 'না না, আমি তোমাকে তাড়া দিতে আসিনি, একটা কথা বলতে এসেছিলাম।'

অমৃতার জিজ্ঞাসু চোখে কৌতূহলের ভ্রূকুটি। জিজ্ঞেস করল, 'কী কথা বল তো?' মধুসূদন তবুও যেন একটু অস্বস্তির সঙ্গে হাসল, 'ও এসেছে মানে—' নামটা না বলেই একটু থেমে বলল, 'একবার দেখা করবে নাকি?'

মধুসূদনের কথা শেষ হবার আগেই অমৃতার স্নিগ্ধ কচি সুন্দর মুখখানি

যেন মুহূর্তেই কঠিন হয়ে উঠল। ওর আরও চোখের কালো তারা দুটো থেকে এক রকমের তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ হানল। এমন কি, দুই মুহূর্ত ওর ঠোঁট দুটো এমন কঠিন আবদ্ধ হয়ে রইল, যেন কোন কথাই বলবে না। কিন্তু মুহূর্তেই ও মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'তুমি ভালোই জানো আমি ওর সঙ্গে জীবনে কোন দিন কখনোই দেখা করব না। তবুও এ বাড়িতে এলেই, কেন আমাকে ডাকো?'

মধুসূদন যেন খুবই ম্রিয়মান হয়ে বলল, 'তুমি কি আমার ওপর রেগে গেলে?'

অমৃতা মধুসূদনের দিকে তাকাল, বলল, 'তোমার ওপর রাগের কোন প্রশ্নই নেই। কিন্তু মধু, তোমার এই উদারতা আমাকে কষ্ট দেয়। ও এ বাড়িতে যতবার এসেছে, তুমি ততবারই আমাকে ডাকতে এসেছ। অথচ, তুমি আমাকে ভালোই চেনো, জানো আমি কখনোই এ জীবনে আর ওর মুখ দর্শন করব না। কারণ এটা কোন রাগের কথা নয়। অপমান আর ঘৃণার কথা। তবু তুমি কেন আমাকে ডাকাডাকি কর? আমার মান অপমানে কি তোমার কিছুই যায় আসে না? আমার জন্য তোমার কোন ফিলিংস নেই?'

মধুসূদন অপ্রস্তুত বিমর্ষ ভাবে অমৃতার কাঁধে একটি হাত রেখে বলল, 'অমি, এ রকম করে বোলো না। তুমি কি ভাবতে পারো, তোমার মান অপমানে আমার কিছু যায় আসে না? আর ফিলিংসের কথা বলছ? আমার কষ্ট হয়। তোমার কথা ভেবে কষ্ট তো হয়ই, ওর কথা ভেবেও কষ্ট হয়। কারণ, আমি বুঝি, ও ভীষণ ভাবে অনুতপ্ত। অন্য কেউ হলে, এ বাড়িতে কখনো আর আসত না—।'

মধুসূদনের কথা শেষ হবার আগেই অমৃতা বলে উঠল, 'কিংবা বল, ওর মতো লোককে কেউ তার বাড়ি ঢুকতে দিত না।'

মধুসূদন ঈষৎ হেসে হাল্কা ভাবে বলল, 'তুমি কখনো বলনি, ওকে যেন এ বাড়িতে আর ঢুকতে না দেওয়া হয়।'

অমৃতা কঠিন স্বরেই বলল, 'তার মানে এই নয় মধু, আমি ওর এ বাড়িতে আসা বিন্দুমাত্র পছন্দ করি। পছন্দের কথা তো অনেক দূরের কথা, এ বাড়িতে ওর পা পড়ে ভাবলেও আমার সমস্ত শরীর ঘৃণায় রি রি করে ওঠে। প্রথম প্রথম আমি প্রতিবাদও করে'ছ, কিন্তু তুমি ওকে ক্ষমা করতে পেরেছ। ও তোমার বন্ধু, আমার কিছু বলার নেই। তোমার বাড়িতে ও এলে আমি কি করতে পারি ?'
মধুসূদন হেসেই বলল, 'এ বাড়ি যে আমার একলার নয়, তা তুমি ভালোই জানো। ঠিকই, প্রথম দিকে তুমি ওর এ বাড়িতে আসা নিয়ে প্রতিবাদ করেছিলে। কিন্তু আমার অনুরোধ মেনেও নিয়েছিলে।'

অমৃতা বলল, 'হ্যাঁ মেনে নিয়েছিলাম, কারণ দেখেছিলাম, তুমি তোমার বন্ধুর সম্পর্কে উদার। তুমি চাও, সে যেন এ বাড়িতে আগের মতোই আসে, কারণ, ও ক্ষমা চেয়েছিল, ও অনুতপ্ত। বেশ তো, তুমি যা চেয়েছ, তাই হয়েছে। ও এ বাড়িতে তোমার কাছে আসে আসুক, আমি সে-বিষয়ে কিছুই বলতে চাইনে, কিন্তু তুমি আমাকে ডাকাডাকি কোরো না। আমার পক্ষে যা সম্ভব নয়, তা আমি কোন দিনই করতে পারবো না।'

মধুসূদন বলল, 'ও কি কেবল আমারই বন্ধু অমি ? তোমার নয় ?'

অমৃতার দু' চোখে যেন এবার আগুনের ঝিলিক হানল। খোলা চুলে ঝাপ্টা দিয়ে সবেগে মাথা নেড়ে বলল, 'না, ও আমার বন্ধু নয়। একটা জীবিত মানুষ আর একটা কবন্ধ কদর্য প্রেতের কোন মিল নেই। সেই জীবিত মানুষটা এককালে আমার বন্ধু ছিল। আজকের কবন্ধ কদর্য প্রেতটা নয়। মধু, তুমি রাগ করলেও আমার কোন উপায় নেই ! তুমি ভালোই জানো, আমি ওর সঙ্গে কখনো দেখা করবো না।'

মধুসূদন যেন কিছুটা ব্যস্ত ভাবে বলল, 'না না অমি, ওর সঙ্গে দেখা করা না করা নিয়ে, আমার রাগের কোন প্রশ্নই নেই। তুমিও আমাকে তো ভালো জানো। সেই ঘটনা ঘটে যাবার পর থেকে, আমার বরাবরই একটা ইচ্ছে, তোমার আর ওর মাঝখানে বিবাদটা মিটে যাক।'

অমৃতার মুখে যেন আগুনের ঝলক, নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হয়ে উঠল, বলল, 'বিবাদ ? এটাকে তুমি বিবাদ বল ? এত বড় একজন আইনজীবি হয়ে, তোমার এ রকম ভুল ?'

মধুসূদন যেন লজ্জিত হেসে তাড়াতাড়ি বলল, 'যাক্, আমি ভুলই বলেছি, বিবাদ নয়। আসলে আমি বলতে চেয়েছিলাম, তোমাদের মধ্যে আবার আগের যোগসূত্রটা ফিরে আসুক।'

অমৃতা মাথা নেড়ে দৃঢ় স্বরে বলল, 'তা আর কোন দিনই হবে না। তুমি আমার স্বামী, তোমার উদারতা নিয়ে তুমি ওর সঙ্গে মিশতে পারো, কথা বলতে পারো, আমি কখনো আপত্তি করবো না। কারণ তোমাকে আমি বুঝি চিনি তোমার উদারতার জন্য আমিও গর্ববোধ করি, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমি তোমার উদারতার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারব না।'

মধুসূদন অমৃতার কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে, যাবার জন্য উদ্যত হয়ে বলল, 'তাহলে তুমি লীনাকে নিয়ে নীচে এসো, আমি যাচ্ছি।'

অমৃতা পিছু না ডেকেও বলল, 'আমি আর এখন বেরোব না ভাবছি। তুমি ড্রাইভারকে সঙ্গে নিয়ে যাও, তোমাকে কোর্টে পৌঁছে, সে লীনাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসবে।'

মধুসূদন যেতে উদ্যত হয়েও ফিরে দাঁড়াল, বলল, 'কেন, তুমি আমার

সঙ্গে যাবে না? ও তো আর আমাদের সঙ্গে যাবে না। ও ওর গাড়ি নিয়ে এসেছে, এখনই চলে যাবে।'

অমৃতার মুখ দেখে স্পষ্টতই বোঝা গেল, কিছুক্ষণ আগেও ওর মুখে যে প্রসন্নতা ছিল। এখন আর তার চিহ্নও নেই। কিছুটা যেন অনিচ্ছা সহকারেই বলল, 'তুমি যদি বল, তাহলে যাব। কিন্তু এখন আর আমার বেরোতে একটুও ইচ্ছে করছে না।'

মধুসূদন হেসে বলল, 'সকালবেলা আমিই তোমার মুডটা নষ্ট করে দিলাম। জানতাম, তুমি কখনোই ওর সঙ্গে দেখা করতে যাবে না, তবু আশা মরীচিকা, একবার না বলতে এসে পারলাম না। ঠিক আছে। তুমি তাহলে থাকো, লীনাকে পাঠিয়ে দাও, আমি ড্রাইভারকে বলছি।'

অমৃতা তাড়াতাড়ি বলল, 'ওকে যদি তুমি এখনই বিদায় কর, তাহলে আমি তোমার সঙ্গেই বেরোতে পারি।'

মধুসূদন এবার সশব্দে হেসে উঠে বলল, 'তুমি এমন ভাবে ওকে বিদায় করার কথাটা বললে, যেন গোটা বাড়িটা তোমার কাছে অশুচি হয়ে উঠেছে।'

অমৃতা বলল, 'থাক মধু, ও কথা আর নয়। আসলে আমি বলছি, ও যদি এখনই চলে যায়, তাহলে আমি নীচে যাব।'

মধুসূদন বলল, 'ও এখনই চলে যাবে। ও আজ ভোরেই পাটনা থেকে ড্রাইভ করে সোজা আমাদের এখানে এসেছে, এখনই কোর্টে যাবে। একটা কেস্ করতেই এসেছে। কিন্তু অমি, আর দেরি নয়, তুমি লীনাকে নিয়ে এসো, আমি নীচে যাচ্ছি।'

মধুসূদন মোড় ঘুরে সিঁড়ি ভেঙে নীচে চলে গেল। আর লীনাও তখনই স্কুলের ইউনিফর্ম পরে, বইয়ের ব্যাগ হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে

এলো। অমৃতা বলল, 'লীনা, দু' মিনিট অপেক্ষা কর। আমি একটু তৈরি হয়ে নিই। তোর মামা এসে সব ভেস্তে দিয়ে গেলেন।' বলেই ঘরের মধ্যে ঢুকল।

অমৃতা যে তার স্বামীকে নাম ধরে ডাকে, এতে আপনারা নিশ্চয়ই অবাক হননি। আজকাল নাম ধরে ডাকাটা অনেক পরিবারেই প্রচলিত হয়ে গেছে। কিন্তু ওদের স্বামী স্ত্রীর কথাবার্তায় নিশ্চয়ই অবাক হয়েছেন? শুধু অবাক না, নিশ্চয়ই খুব কৌতূহল বোধ করছেন, এবং কার সঙ্গে দেখা করা নিয়ে, এত কথাবার্তা, তাও নিশ্চয় জানতে চান। আরও জানতে চান অনিবার্য ভাবেই, কেনই বা অমৃতা ওর সঙ্গে দেখা করতে চাইল না।

সবই জানতে পারবেন, একটু ধৈর্য ধরুন। কেবল মনে রাখবেন, প্রপঞ্চিত মায়ার কথাটা। জীবনকে এর দ্বারা আমি অলীক বলি না। নিত্যকালের মধ্যে যেমন একটা সত্য আছে, অনিত্যতার মধ্যেও তেমনই সত্য আছে। কাল নিরবধি। কিন্তু দেখুন, কত হাজার হাজার ধ্বংসাবশেষের ওপর দিয়ে, আর নবজন্মের ভিতর দিয়ে এই নিরবধি কাল চলেছে।

এবার নীচে যাই চলুন।

মধুসূদন নীচের তলায় ওর অফিস ঘরে এসে পৌঁছাল। ওর থেকে মাথায় কিছু ছোট, সবল স্বাস্থ্যের একজন চেয়ারে বসে ছিল। বয়স প্রায় দুজনেরই সমান। কিন্তু যে বসে ছিল, তার মাথার চুল কিছুটা পাতলা, যদিও টাক পড়েনি। ইতিমধ্যেই কপালে এবং কানের কাছে কয়েকটি রুপোলি রেখা দেখা দিয়েছে। এ বয়সে এটা অকাল পক্বতারই লক্ষণ বলতে হবে। গায়ের রঙ প্রায় মধুসূদনের মতোই। চোখ দুটি বড়। কিন্তু একটু যেন আরক্ত। হতে পারে, খুব ভোরে উঠে অনেক দূর থেকে গাড়ি চালিয়ে এসেছে বলে, চোখ ঈষৎ লাল দেখাচ্ছে। তার পরণেও শাদা ট্রাউজার, শাদা শার্ট, এবং গায়ে

টেরিকটের কালো কোট। চোখে মুখে বুদ্ধির দীপ্তিই শুধু নেই তার মুখশ্রীটি ভালো। কোমলতা তেমন নেই, কিন্তু কর্কশ নয়। বয়সের তুলনায় তাকে যেন বেশি গম্ভীর মনে হয়।

মধুসূদন ঘরে ঢুকেই বলল, 'সরি অজয়, দেরি হয়ে গেল।'

অজয়ও প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি ভীষণ তাড়া বোধ করছি, অথচ তুই আসছিস না বলে যেতেও পারছি না। আমি আর এক মিনিটও বসব না। আমার ক্লায়েণ্টরা হয়তো ভাবছে, আমি এখনো এসে পৌঁছতেই পারিনি। তুই পরে আয়, কোর্টে দেখা হবে।'

মধুসূদন বলল, 'দাঁড়া, একটু চা খাবি না? আমি তো আগেই তোকে চা খাবার দিয়ে যেতে বলেছি।'

অজয় তার এ্যাটাচি কেসটা হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে, হেসে বলল, 'তুই আসার আগেই, আমি ও-পর্বটা সেরে ফেলেছি। তবে তোদের ওই পাঁড়েজী এত খাবার নিয়ে এসেছিল, আমার পক্ষে খাওয়া সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া এখন আমার পক্ষে খাওয়া সম্ভবও নয়। চা খেয়েছি। ফার্স্ট আওয়ারেই আমার কেস্ উঠবে। আমি চলি। তুই কোর্টে এলে দেখা হবে।' বলেই হাত তুলে, বিদায় জানাবার ভঙ্গি করে, প্রায় ছুটেই বেরিয়ে গেল।

মধুসূদনও বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। অজয় অতিথি ভবনের কাছে রাখা তার গাড়িতে উঠেই, এঞ্জিন স্টার্ট করে খোলা গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল। মধুসূদনের মুখে আস্তে আস্তে নেমে এলো অন্যমনস্কতা। সে যে বাইরের গেটের দিকেই তাকিয়েছিল, তা নয়। আসলে ওর মনটা চলে গেছে অন্য কোথাও। ও নিজেও সচেতন নয়, যে ও ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে অন্য এক জগতে চলে গেছে।

লীনা পিছন থেকে এসে ডাকল, 'মামা, এখন বেরোবে তো ?'

মধুসূদন চমকে পিছন ফিরে, লীনার দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এখনই বেরোব। তোর মামীমা কোথায় ?'

লীনা কিছু বলবার আগেই, অমৃতা ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল, বলল, 'এসে গেছি। এই নাও গাড়ির চাবি, আর তোমার এ্যাটাচি।'

মধুসূদন বলল, 'তুমি টেবিল থেকে সব নিয়েই বেরিয়েছ ?'

অমৃতা বলল, 'হ্যাঁ, আর দেরি করলে লীনার স্কুলের দেরি হয়ে যাবে।'

মধুসূদন বারান্দা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলল, 'এক সেকেণ্ড, আমি গাড়িটি বের করে নিয়ে আসছি।' বলেই তাড়াতাড়ি, দু' পাশের গাছের সারির মাঝখান দিয়ে, গ্যারেজের দিকে গেল।

গ্যারেজের খোলা দরজার সামনেই, ড্রাইভার বেচন দাঁড়িয়ে ছিল। হিন্দিতে বলল, 'গাড়ি ধোয়া সাফাই হয়ে গেছে।'

মধুসূদন বল 'ঠিক আছে। তুমি বিকেলে ঠিক সময়ে কোর্টে গাড়ি নিয়ে এসো।' বলে ও দরজা খুলে সামনের চালকের আসনে বসে, গাড়ি স্টার্ট দিয়ে একেবারে গাড়িবারান্দার নীচে এসে দাঁড়াল। ঝুঁকে পড়ে বাঁদিকের দরজা খুলে দিল।

অমৃতা আগে উঠে, লীনাকে তুলে নিয়ে দরজা বন্ধ করল। মধুসূদন গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করেনি। গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে, গেট দিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় পড়ল।

লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই, অমৃতা ইতিমধ্যেই মধুসূদনের মুখের দিকে দু-একবার আড়চোখে দেখে নিল। আর মধুসূদনও ঠিক তাই। গাড়ি চালাতে চালাতেই ও বারদুয়েক অমৃতার মুখের দিকে চোখের কোণ দিয়ে দেখে নিল। আসলে ওদের পরস্পরের দেখার মধ্যে

কোন রহস্যই নেই। দুজনেই দুজনের জন্য সমান চিন্তিত। দুজনেই ভাবছে, কেউ কারো আচরণের জন্য ক্ষুব্ধ বা বিরক্ত হয়েছে কী না।

অমৃতা ভাবছে স্বামীর প্রতি ওর আচরণ রূঢ় হয়ে গেছে কী না। মধুসূদন ভাবছে, যে-বিষয়ে অমৃতা অন্তত এবার নিয়ে বারো চোদ্দবার ওকে প্রত্যাখ্যান করেছে, সে-বিষয়ে ওকে জিজ্ঞেস করায় ও খুব বেশি ক্ষুব্ধ হয়েছে কী না। লীনা অবশ্য এ সবের মধ্যেই নেই। ও সামনের দিকে তাকিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছে। তবে দেখবেন, স্বামী স্ত্রীর এই মনে মনে ভাবনাটাকে যেন আবার গিল্‌টি কনসাস্‌নেস্‌ ভেবে বসবেন না। আপনারা যাঁরা আধুনিক মানুষ, যাঁরা মনস্তত্ত্ববিদ্‌, তাঁরা অনেক সময়েই কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে নাকি সাপ বের করে থাকেন। তবে সাপটা কী সাপ, সেটাই ভাববার। হেলে ঢোঁড়ার মতো নির্বিষ সাপও অনেক আছে তো। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সেই রকম একটি সাপ বের করেই হয়তো আশেপাশের লোকসমাজকে সচকিত আর বিস্মিত করে তুললেন। সত্যি, আপনাদের এই আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের আমি বড় ভয় পাই।

অমৃতা আর মধুসূদনের পরস্পরের ভাবনাটা আসলে, ওদের নিজেদের একটা আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং-এর ব্যাপার। অপরাধ বোধের কণামাত্রও ওদের মনে নেই, তার কোন কারণও নেই। অমৃতা মানুষ হিসেবে ওর স্বামীকে যতটা জানে, তাতে করে, মধুসূদন এমন কোন আচরণই করে না, যার ফলে ওকে রূঢ় কথা বলা যায়, বা কোন বিষয়েই প্রত্যাখ্যান করা যায়। তবু এই একটা বিষয়ে ও নিরুপায়। ওর ভিতরটা আপনা থেকেই অতি কঠিন ও কঠোর হয়ে ওঠে। অশান্ত হয়ে ওঠে প্রাণ। আর সত্যি কথা বলতে কি, রাগ অভিমান করবার অধিকার তো একজনের ওপরেই আছে। একজনকেই প্রাণের সব কথা, সব কিছু অকপটে প্রকাশ করা যায়।

মধুসূদন সেটা ভালোই জানে। কিন্তু ওর চরিত্রের মধ্যে এমন একটা

সারল্য, সরস সাবলীলতা আছে, মানুষকে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ও অন্ধকারের কোটরে বসে থাকতে পারে না।

তাহলে একটা কথা পরিষ্কার করেই বলি। আমার এই পতঙ্গ ভাবনাকে আপনারা, রবীন্দ্রভক্ত আঁতেলরা ক্ষমা করবেন। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, আর আপনারাও কথাটা বলে বলে, বোধহয় নিজেদের কানকেই পচিয়ে ফেলেছেন, 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানোই পাপ।'—কথাটা শুনতে খুবই ভালো, দারুণ মহৎ, কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনাদের থেকে মানুষের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা কিছু কম ছিল না। সেই জন্যই, বড় অসহায় তিক্ততার সঙ্গেই কথাটা বলতে হয়েছে। যেখানে বিশ্বাস করার কিছু নেই, অথচ যাদের ছাড়া এক পা চলা যাবে না, অতি করুণ ভাবে তাদের সম্পর্কে এই কথা বলা ছাড়া আর কী উপায় আছে, 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ!' মানুষ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা যে বড় মর্মান্তিক!

জানি, আমার কথা শুনে, আপনারা অনেকেই দাঁতে দাঁত পিষে আমার ডানা দুটো ছিঁড়ে দিতে চাইছেন। বিশেষ করে যাঁরা আবার প্রগতিশীল, তাঁরা তো পারলে আমার মুণ্ডুটাকেও থেঁতলে গুঁড়িয়ে দিতে পারলে শান্তি পেতেন। কিন্তু, ঈশ্বরে সমর্পিত প্রাণ, আপনাদের কবিগুরুর হৃদয়ের গভীর কথাটি শোনবার চেষ্টা করে দেখবেন! না, তার জন্য কবিগুরুর হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করার দরকার নেই। তাঁর লেখনীর মধ্যেই সব কথার জবাব আছে।

কিন্তু মধুসূদন রবীন্দ্রনাথ নয়—মানে, মধুসূদন মিত্র। ও বলে বেড়ায় না, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। সংসারে ও সেই সব মানুষের দলে পড়ে, যারা মানুষ মাত্রকেই সহজ ভাবে গ্রহণ করে। ওকে ভাবতে হয় না, বিশ্বাস হারানো পাপ। বিশ্বাসটা ওর এমনই সহজাত, সে কোন অন্যায় করলেও, ও তার অনুতাপ সংশোধনে বিশ্বাসী। তথাকথিত ভালো মানুষ, আর সহজাত ভালোমানুষের

মধ্যে দুস্তর ফারাক। সেই কারণেই, প্রত্যাখ্যান নিশ্চিত জেনেও ওর বন্ধু অজয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য ও অমৃতাকে বলতে যায় অমৃতার কঠিন মুখ, রূঢ় কথা ওকে ব্যথিত করে না, একটা দুঃখ ওর প্রাণে বাজতে থাকে।

অমৃতার প্রতি ওর মন ক্ষুণ্ণ হয় না। কিন্তু অজয়কেও ও ভালবাসে। বিশ্বাসও করে। তবু ওর মনে হতে থাকে, অকারণেই অমৃতার মনটা খারাপ করে দিলাম।
অদূরেই কোর্ট আর তার আশপাশের ভিড় দেখা গেল। আর এ সময়ে অমৃতার সঙ্গে মধুসূদনের চোখাচোখি হয়ে গেল। দুজনেই হেসে উঠল। মধুসূদন বলে উঠল, 'আসলে—!'

অমৃতা বাধা দিয়ে বলল, 'আসলে, তুমি আমার ওপর হয়তো রেগে গেছ।'

মধুসূদন তাড়াতাড়ি বলল, 'সে-কথাটা তো আমিই বলতে যাচ্ছিলাম, আসলে তোমাকে বিরক্ত করতে চাইনি।'

অমৃতা হেসে বলল, 'আসলে, আমিও তোমাকে ওভাবে বলতে চাইনি। আমার কোন উপায় নেই।'

মধুসূদন গাড়ির গতি কমিয়ে কোর্টের নিকটবর্তী হতে হতে বলল, যাই হোক, 'এ নিয়ে সারাদিন যেন মন খারাপ করে থেকো না।'

অমৃতা বলল, 'তুমিও মনোযোগ দিয়ে মক্কেলদের মামলাগুলো দেখো।'

দুজনেই আবার হেসে উঠল। লীনা কিছু বুঝুক, না বুঝুক, মামা মামীর হাসি দেখে, অকারণেই ওরও ঠোঁটে হাসি ফুটল। এ সময়টা কোর্টের চত্বরে, আশেপাশে গাছতলায়, রকমারি দোকানের চারপাশে বেশ ভিড়। এ সময়ে ভিতরে গাড়ি ঢোকানো যায় না। মধুসূদন রাস্তার ওপরেই গাড়ি দাঁড় করালো! ও দরজা খোলবার আগেই, ওর মুহুরি আর ক্লার্ক, দুজনেই এসে সামনে দাঁড়াল। মুহুরি লোকটি

বাঙালী, ক্লার্ক এ দেশীয় অধিবাসী। এই হিন্দির যুগে, এ দেশীয় লোক ছাড়া এখানে কাজকর্ম চালানো যায় না। দুজনেই এসে, কপালে হাত ঠেকিয়ে মধুসূদনকে 'গুডমর্নিং' করল। মধুসূদনও নমস্কার জানিয়ে দরজা খুলল। মুহুরি হাতটা বাড়িয়ে দিল।

মধুসূদন তার হাতে এ্যাটাচিটা বাড়িয়ে দিয়ে অমৃতার দিকে ফিরে বলল, 'তা হলে তুমি লীনাকে নিয়ে যাও। আমি নামছি।'

অমৃতা হেসে বলল, 'যে আজ্ঞা !'

মধুসূদন ঈষৎ হেসে গাড়ি থেকে নেমে গেল। অমৃতা ডানদিকে সরে গিয়ে স্টিয়ারিংয়ে বসল। দেখতেই পাচ্ছেন, আশপাশের ভিড়ের মুখগুলি কী অবাক কৌতুহলে অমৃতার দিকে তাকিয়ে দেখছে। অমৃতা গাড়ি স্টার্ট করে, সোজা এগিয়ে গেল। কিছু দূরেই শাল মহুয়ার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে, আকাশের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, চার্চের ক্রস্। এখানেই লীনার স্কুল !

অমৃতা যখন লীনাকে স্কুলের গেটের কাছে নামিয়ে দিল, তখন ওয়ার্নিং বেল ঢং ঢং করে বেজে উঠল। লীনা ব্যাগসহ, গাড়ির দরজা খুলে, নামতে নামতে বলল, 'যাচ্ছি মামীমা।'

অমৃতা গাড়ির স্টার্ট বন্ধ না করেই বলল, 'আয়।'

লীনা চলে যেতেই, অমৃতা স্টিয়ারিং ডানদিকে ঘুরিয়েও আবার তাড়াতাড়ি সোজা করে নিল। সামনের রাস্তাটার দু' পাশে ঢেউ খেলানো লাল মাটির প্রান্তর। দূরের আকাশে দেখা যাচ্ছে একটি পাহাড়। অমৃতা জানে, রাস্তাটা দিয়ে সোজা গেলে খানিকটা বন-বনান্তরে ঘুরে আসা যায়। সাধারণত ও এ সময়ে শহরের মধ্যস্থলে চকের দিকেই যায়। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে ও গাড়ি না ঘুরিয়ে সোজা সামনের দিকে এগিয়ে চলতে লাগল।

আপনারা একটু লক্ষ্য করে দেখলেই বুঝতে পারবেন, অমৃতা প্রায়

সত্তর থেকে আশি কিলোমিটার বেগে গাড়ি চালাচ্ছে। কিন্তু ওর চোখে মুখে গভীর অন্যমনস্কতা। ওর খোলা চুল উড়ছে, মাঝে মাঝে গালে এসে ঝাপটা খাচ্ছে। ব্যাপারটা মোটেই ভালো না এত স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছে, অথচ স্পীডোমিটারের কাঁটার দিকে একটুও খেয়াল নেই। আর কেবল অন্যমনস্কতাই নয়, ওর অন্যমনস্ক মুখে যেন একটা যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠেছে। ঠোঁট দুটো ক্রমে শক্ত হয়ে যেন যন্ত্রণাটা সহ্য করার চেষ্টা করছে। আমারই বুক কেঁপে যাচ্ছে। এক একটা বাঁকের মুখে, আচমকা ব্রেক কষে, ধুলো উড়িয়ে, ও যে-ভাবে ছুটে চলেছে, যেন মনে হয়, ওকে পিছন থেকে ডাকাতে তাড়া করেছে।

না, ঠিক তা নয়, ও যেন কারোকে পিছনে তাড়া করে ধরবার জন্য ছুটেছে, আর ক্রমেই ওর মুখের যন্ত্রনার অভিব্যক্তি তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। তারপরে হঠাৎ ও আপন মনেই আর্তনাদ করে উঠল, 'না না, এ কি!' বলেই ও যেন ওর সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলল। গাড়িটা আচমকা ব্রেক কষে দাঁড় করিয়ে দিল রাস্তার ধারে। মাথাটা নুইয়ে দিল স্টিয়ারিংয়ের ওপর। আর ঘন ঘন মাথা নাড়াতে লাগল।

চলুন, আমরা কয়েক বছর আগে, পাটনা শহরে ফিরে যাই। অবশ্য কয়েক বছরের অনেক আগের বছরগুলোতেও আমরা পাটনায় ফিরে যেতে পারি। অন্তত দশ-এগারো বছর আগে। কিন্তু আপাতত অনধিক তিন বছর আগে ফিরে চলুন পাটনা শহরে। দেখতেই পাচ্ছেন, যে-গাড়িতে একটু আগেই অমৃতাকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে, যন্ত্রণায় কাতর হয়ে আচমকা থেমে দাঁড়াতে দেখলেন, সেই গাড়িই চালাচ্ছে মধুসূদন মাঝখানে অমৃতা। ওর বাঁ পাশে অজয়। অজয় মজুমদার, যাকে কিছুক্ষণ আগেই ব্যস্তভাবে মধুসূদনের ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছেন। সময় বিকাল, ঋতুটা পাটনার ক্ষেত্রে শীত বসন্তের মাঝামাঝি ফাল্গুনের প্রথম দিক। দেখতেই পাচ্ছেন, গাড়িটা

সিভিল লাইন এলাকা থেকে, দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর সেই বিখ্যাত ভাস্কর্যের পাশ দিয়ে এগিয়ে চলেছে। তিনজনেই বেশ ঘনিষ্ঠ ভাবে বসে, নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে।

অমৃতার সাজগোজটা চোখে পড়ার মতো, তাই না? একে তো ওকে সুন্দরী বলতেই হবে। ওর তেমন শীতবোধ নেই। তবে একেবারে পাতলা শাড়ি পরেনি। তশরের শাড়ি কখনোই রেশমের মতো খুব পাতলা হয় না। তশরের শাড়িটির লাল পাড়, দুই রঙের আঁচল, আর তারই সঙ্গে মিলিয়ে, ও পরেছে একটি স্লিভলেস্ জামা। হাতে ঘড়ি ছাড়া, কোন অলংকারই ওর শরীরে নেই। মাথার খোলা চুলকে সামলাবার জন্য, পিছনে টেনে ঘাড়ের ওপরেই একটি স্কার্ফ দিয়ে কষে বেঁধেছে। হঠাৎ দেখলে, ফিতে জড়ানো মনে হতে পারে। আসলে তা নয়। রঙিন রেশমী স্কার্ফের বাঁধনটা কেবল ওর চুলেরই একটা সৌন্দর্য এনে দেয়নি, একটা অতিরিক্ত বর্ণাঢ্যতার সৃষ্টি করেছে। বাতাসে ওর চুল গালে এসে উড়ে পড়তে পারছে না, পিছন দিকে রেশমী স্কার্ফ আর গোড়ার চুল পিছনে ঝাপ্টা খাচ্ছে।

অমৃতার সাজ-সজ্জায় কোন স্থূল বাহুল্য কখনো থাকে না। কিন্তু ওর রূপ আর স্বাস্থ্য, সামান্য সাজেই কেমন অসামান্য হয়ে ওঠে। শিখর-দশনা রমণীটিকে এখন কী অসম্ভব দ্যুতিময়ী দেখাচ্ছে। অবশ্য ঠোঁটে স্বাভাবিক রঙের কিঞ্চিৎ প্রলেপ আছে। চোখে আছে কাজলের সূক্ষ্ম টান। এ সব তো খুবই সাধারণ ব্যাপার। একটা মৃদু অথচ মদির গন্ধ পাচ্ছেন কী? ওটা অমৃতার জামা কাপড় থেকেই ছড়াচ্ছে। ওটা একটা নামী সুগন্ধি যার কয়েক ফোঁটা ও ব্যবহার করেছে।

মধুসূদন আর অজয়, দুজনের পোশাকেই পুরোদস্তুর সাহেবী কেতা। পায়ের জুতো থেকে, গলার নেকটাই আর একরঙের স্যুট। আজকের দেখার সঙ্গে, তিনজনের চেহারার কোন পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছেন

কী? অন্তত মধুসূদন আর অমৃতার ক্ষেত্রে, তেমন কোন পরিবর্তনই চোখে পড়ছে না। কিন্তু আজ যে অজয়কে দেখা গেল, অনধিক তিন বছর আগের অজয় যেন একেবারেই আলাদা। ওর চেহারার দোহারা গড়নটা ঠিকই আছে, তবু ওকে দেখাচ্ছে যেন অনেক—অনেক তরুণ। এমন কি, তুলনায় মধুসূদনের থেকেও তরুণ, হাসিখুশি। জুলপি বা কপালের কাছে একটিও রুপোলি চুল নেই। বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুকোজ্জ্বল চোখ, স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন তাজা।

মধুসূদন জিজ্ঞেস করল, 'অজয়, তাহলে কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

অজয় বলল, 'বললামই তো, দরিয়াগঞ্জ ক্লাবে যাব।'

অমৃতা অজয়ের দিকে ফিরে, কপট ধমকের সুরে বলল, 'ওখানে যাওয়া মানেই তো তোমাদের গুচ্ছের ড্রিংক করা। এসব নতুন পাখা গজানো পাখির ছানাদের নিয়ে, আমার হয়েছে মুশকিল।' বলে ও মধুসূদনের দিকে তাকাল।

মধুসূদন আর অজয় চোখাচোখি করে হেসে উঠল। মধুসূদন বলল, 'অজয় তুলনাটা শুনলি তো? তুই আর আমি অমির কাছে নেহাতই পাখির ছানা।'

অমৃতা বলল, 'তা ছাড়া আর কী বলব? নতুন ড্রিংক করতে শিখে, তোমাদের অবস্থা নতুন পাখা গজাবার মতোই হয়েছে।'

অজয় বলল, 'তাহলে অমি, আমি বলি, পাখির ছানা হয়ে থাকা খুবই লোভনীয় ব্যাপার, যদি সে-রকম একটি মা পাওয়া যায়।'

অমৃতা হেসে উঠে বলল, 'না বাবা, তোমার মতো দস্যি পাখির মা হতে আমি পারব না।'

তিনজনেই সরবে হেসে উঠল। অজয় বলল, 'এ বেলা পেছোলে চলবে কেন? আসলে তুমি পাখির ছানার সঙ্গে তুলনাটা মধুরই

দিয়েছ। তুমি ভালোই জানো, ড্রিংকসের ব্যাপারে, ওর থেকে আমি অনেক আগেই হাত পাকিয়েছি।'

অমৃতা ঠোঁট ফুলিয়ে, যেন খানিকটা রাগ আর অভিমানের ভঙ্গিতে বলল, 'বড় ভালো কাজ করেছ। কেন যে এ সব ছাই পাঁশ খেতে শিখলে তোমরা ?'
মধুসূদন একবার অমৃতার দিকে দেখে নিয়ে, ঠোঁট টিপে হেসে বলল, 'তুমি কিন্তু এক-আধটু আমাদের সঙ্গ দিয়েছ।'

অমৃতা হেসে বলল, 'সে তো দায়ে পড়ে। সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে নরকবাস। কিন্তু যাই বল, তোমরা কেউ কিন্তু বেশি খেতে পারবে না।'

মধুসূদন বলল, 'আমাকে তো তোমার এ কথা বলাই চলে না। কারণ, আমি দেড় ছ' পেগেই কাত্। তার ওপরে আমাকে গাড়ি চালাতে হবে। অবশ্য তুমি থাকলে আমার সে ভয় নেই। তোমার বকতে হয়, অজয়কে বকো। ওকে আমিও সামলাতে পারি না।'

অজয় ভুরু কুঁচকে, ডাইনে ঝুঁকে পড়ে, অমৃতা আর মধুসূদনকে দেখে নিয়ে বলল, 'বাঃ, চমৎকার! একেই বলে, ইউনিটি অফ হাজব্যাণ্ড এ্যাণ্ড ওয়াইফ। এখন যত দোষ নন্দ ঘোষ! থাক, তাহলে আজ দরিয়াগঞ্জ ক্লাবে গিয়ে কাজ নেই, আমি ড্রিংকও করব না।'

অমৃতা কুণ্ঠিত বিব্রত হেসে বলল, 'অজয়, সত্যি রেগে গেলে নাকি ?'

অজয় ঠিক রাগেনি, কিঞ্চিত আহত হয়েছে। কিন্তু তা বুঝতে না দিয়ে কপট ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, 'আলবৎ রাগ করব, হাজারবার রাগ করব। স্বামী বলে তুমি কেবল মধুর সাইড নিয়ে বলবে ?'

মধুসূদন অবাক হয়ে বলল, 'অমি আবার আমার সাইড নিয়ে কখন বলল। আমিই তো বরং অমিকে বললাম, বকতে হয় অজয়কে বকো, আমিও ওকে সামলাতে পারি না।'

অমৃতা বলল, 'আর আমি তোমাকে মোটেই বকিনি অজয়। মধুর চালাকি আমি বুঝতে পেরেছি! ও নিজেকে বাঁচিয়ে সব দোষটা তোমার ঘাড়ে চাপাবার তালে আছে। যেন ও ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না।'

অজয় ভ্রু কুঁচকে সন্দিগ্ধ চোখে অমৃতার মুখের দিকে দেখল। অমৃতা ভ্রূ তুলে, ঘাড় বাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমার পার্শিয়ালিটির সম্পর্কে তোমার এখনো সন্দেহ হচ্ছে?'

অজয় সে-কথার কোন জবাব না দিয়ে, মধুসূদনের দিকে তাকাল। মধুসূদন মুখ টিপে হাসছে আর গাড়ি চালাচ্ছে। অজয় বলল, 'তোমাকে সন্দেহ করছি না বটে। মধুর হাসিটা দেখেছ? ওর হাসিটাই সন্দেহজনক।"

মধুসূদন হেসে উঠে বলল, 'আমি অন্য কিছু ভেবেই হাসছি না। আমি হাসছি অমির কথা শুনে। ভাজা মাছ উল্টে খেতে আমি জানি, কিন্তু তুমিই বল তোমার নতুন ডানা গজানো পাখির ছানা দুটোর মধ্যে, ড্রিংক্‌সের ব্যাপারে কে বেশি যায়?'

অমৃতা কারোর দিকে না তাকিয়ে, মুখে হাসি নিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মাতালরা সবাই সমান। তাদের কারোর যুক্তিই আমি মানিনে!'

নারীজাতির এটাই বৈশিষ্ট্য, তাই নয় কী? সে সব দিক রক্ষা করতে চায়। পারে কী না, সন্দেহ আছে। এ ক্ষেত্রে তো স্বামী আর স্বামীর বন্ধু। স্বয়ং পাঞ্চালী, পাঁচ ভাইয়ের সমান ভাগের অংকশায়িনী হয়েও, শেষ রক্ষা করতে পারেনি। অর্জুনের প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব বরাবরই বেশি দেখা গেছে।

মধুসূদন যেন বড়ই আহত স্বরে বলল, 'অমি, তা বলে তুমি আমাদের মাতাল বললে?'

অমৃতা অজয়ের দিকে তাকিয়ে একবার হাসল, বলল, 'তা দ্রব্যগুণ বলে একটা কথা আছে বৈকি। তা নইলে আর ড্রিংক করা কেন? আমি মাতাল বলেছি, দাঁতাল তো বলিনি? কী বল অজয়?'

অজয় মধুসূদনের দিকে তাকিয়ে একটু আমতা আমতা করে বলল, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। তবে আমি আর মধু একদিনও মাতাল হইনি। হয়েছি মধু?'

মধুসূদন তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, 'আমার তো মনে পড়ে না।'

অমৃতা হাততালি দিয়ে হেসে উঠে বলল, 'বাঃ, এই তো দেখছি মাতালদের যুক্তি আর ইউনিটি। এখন আমিই পড়ে গেলাম ফাঁকে।'

অজয় আর মধুসূদন, দুজনেই হেসে উঠল। অমৃতাও সেই হাসিতে যোগ দিল।

মধুসূদন বলল. 'আমরা ঠিক মাতাল হই না, তবে একটু টিপ্‌সি হয়ে যাই।'

অমৃতা বলল, 'আরো চমৎকার। বাংলায় ওটাকে কী বলে? গোলাপী আমেজ?'

অজয় বলল, 'ঠিক বলেছ। টিপ্‌সির থেকে গোলাপী আমেজ কথাটাই শুনতে ভালো।'

অমৃতা কারোর দিকে না তাকিয়ে, ওর সুন্দর ঠোঁট দুটো বাঁকিয়ে বলল, 'বাংলায় একটা কথা আছে, শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল।'

অজয় আর মধুসূদন আবার হেসে উঠল। মধুসূদন বলল, 'কিন্তু অমি, শুঁড়ি আর মাতালের পেশাগত বা নেশাগত মিল নেই। আমাদের মধ্যে কে শুঁড়ি, কে মাতাল, সেটা বল।'

অমৃতা বলল, 'ময়রা যেমন সন্দেশ খায় না, শুঁড়ি তেমনি মদ খায় না।

এমন কথা কেউ কখনও বলে না। সেই জন্যই, চোরের সাক্ষী যেমন গাঁটকাটা। তেমনি শুঁড়ির সাক্ষী মাতালকে বলা হয়েছে। আসলে দুজনেই সমান।'

অজয় হাত জোড় করে বলল, 'মধু, অমির কাছে হার মেনে নে। ওর সঙ্গে কথায় আমরা কোনদিন পারিনি, আজও পারব না।'

মধুসূদন হেসে বলল, 'সত্যি অজয়, তোর কোন কালে আর বুদ্ধিশুদ্ধি হবে না। অমিকে যবে থেকে বিয়ে করেছি, তবে থেকেই তো ওর কাছে হার মেনেছি।'

অজয় অমৃতার দিকে ঝুঁকে বলল, 'অতএব দেবী, মার্জনা কর। তুমি ভালোই জানো, এখন আমরা কাজের লোক হয়ে গেছি। মধু তো রীতিমত সংসারী। অল্পবিস্তর পান করলেও, তোমার মুখে মাতাল অপবাদ শুনতে বড় কষ্ট হয়।'

অমৃতা চোখ বড় করে বলল, 'অপবাদ? অপবাদ তোমাদের আমি মোটেই দিই নি। আসলে ভয় পাই। বিশেষ করে, তোমাদের পেশার অনেককেই দেখি, আস্তে আস্তে তারা ঘোর মাতাল হয়ে ওঠে।'

মধুসূদন মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করল, 'অবজেকশান অমি। আমার বাবা কখনো মদ স্পর্শ করেননি।'

অজয় তাড়াতাড়ি যোগ করল, 'আমার বাবাও না।'

অমৃতা হেসে উঠে বলল, 'দুজনেই তোমরা তোমাদের পিতাদের নিয়ে পড়লে কেন? আমি আমার সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে বলেছি। তোমরা নিজেরাই বল না, তোমাদের ল-ইয়ার্সদের মধ্যে মদ্যপের সংখ্যা কম না বেশি।'

মধুসূদন বলল, 'এ বিষয়ে তুমি কোন এ্যাক্যুরেট হিসাব দিতে পারো না। ডাক্তার বা এঞ্জিনীয়ারদের মধ্যেও অনেকে মদ্যপান করে।

তার পারসেন্টেজ করা সম্ভব নয়। ল-ইয়ার্স, তাদের মধ্যে যে যত বড় দরের আইনজীবিই হোক না, তাদের একটা সময় মেনে চলতেই হয়। যতক্ষণ কোর্টে থাকতে হবে, ততক্ষণ সে ড্রিংক করতে পারবে না। নাম করা মাতাল ব্যারিস্টার হলেও নয়। সে-ক্ষেত্রে তো শুনেছি, অনেক ডাক্তার দু-এক ঢোঁক গিলেই নাকি অপারেশন টেবিলে হাজির হয়। এঞ্জিনীয়ারদের কারো কারো পকেটেও নাকি বোতল থাকে। যখন খুশি খুলে চুমুক দিলেই হল। আমরা তো তা পারিই না। মহামান্যাধিকারীর এক কলমের খোঁচায় আমাদের গোটা জীবনটাই বরবাদ হয়ে যাবে।'

অমৃতা বলল, 'যুক্তিগুলো ঠিকই দিয়েছ। দুঃখের বিষয়, রবিবার ছাড়া কোন উকীলকেই সকাল থেকে বোতল গেলাস নিয়ে বসতে দেখা যায় না বটে। কিন্তু নেশাখোরদের কথা আলাদা। কোন রকমে কোর্ট একবার শেষ করতে পারলেই হয়। তারপরেই তৃষিত চাতকটির মতো বোতল গেলাস নিয়ে বসে যায়। পাটনার কথা আলাদা। এখানে হাইকোর্টের ল-ইয়ারদের তো আলাদা ব্যাপার। তোমাদের ডিস্ট্রিক্ট টাউনের কথাই আমি বলছি।'

অজয় বলল, 'তা যদি বল, কোন্ সেক্‌শনের, বা কোন্ ক্লাসের লোকেরা বেশি মদ খায়, সেই হিসাবে আমাদের তথাকথিত ডোম মেথর মুদ্দোফরাসরাই সব থেকে বেশি মদ খায়।'

অমৃতা বলল, 'তাদের সঙ্গে যদি তোমরা নিজেদের তুলনা কর, তাহলে কিছু বলার থাকে না। যাদের কথা বললে, আমার ধারণা, এ্যাজ এ ক্লাস, তারা হলো সমাজের ওয়ার্স্ট সাফারার। তোমাদের ক্লাবে হোটেলে বারে গিয়ে ড্রিংক করাকে বলো, রিলাক্স করা। আমি শুনেছি, ওদের মেয়ে পুরুষ, মায় বাচ্চাটাও পর্যন্ত মদ খায়। হেল্‌পলেস্ লিভিংয়ের জন্য। তোমরা তো তা নও।'

মধুসূদন বলল, 'ব্যাপারটা যেন কী রকম সীরিয়স হয়ে উঠছে। গাড়ি ঘোরাব নাকি ?'

অমৃতা বলল, 'না, গাড়ি ঘোরাতে হবে না, আমার কোন প্রেজুডিস্ নেই, তোমরা ভালোই জানো। থাকলে তোমাদের সঙ্গে এক আধটু আমিও সঙ্গ দিতাম না। কিন্তু সমাজের নিপীড়িত শ্রেণীর সঙ্গে তোমাদের কোন তুলনা চলে না।'

অজয় তাড়াতাড়ি হাত জোড় করে বলল, 'দোহাই দেবী অমি, আমাকে ভুল বুঝো না। আমি কোন তুলনাই দিতে চাইনি, নেহাত একটা পরিসংখ্যান দিতে চেয়েছিলাম।'

অমৃতা হেসে বলল, 'জোড় হাত করতে হবে না, বুঝেছি। আমি পাটনার মেয়ে। যে-জেলায় বিয়ে হয়েছে, আর যে-শহরে থাকি, সেখানকার আদিবাসী আর গরীব বস্তির নরনারীদের জীবন তো রোজই দেখি। তুমি একটা পরিসংখ্যান দিলে বটে, সেটাও আমি মানি। তাদের পানীয়টা খাদ্যও বটে। তাদের সঙ্গে তোমাদের তফাতটা পরিসংখ্যানগত নয়, গুণগত। এটাই হচ্ছে আমার বক্তব্য। আর আসল কথাটা যদি শুনতে চাও, সেটা আলাদা।'

মধুসূদন মুখ ফিরিয়ে অমৃতাকে একবার দেখে নিয়ে বলল, 'এর পরেও আসল কথা কিছু আছে নাকি ?'

অমৃতা বলল, 'তা আছে। দেখ, আমরা মেয়েরা মুখে যা-ই বলি, আর যত উদারতাই দেখাই, আসলে আমরা স্বামী পরিবার নিয়ে সুস্থ ভাবে সংসার করতে চাই। মদ খাওয়াটাকে চিরদিনই আমরা ভয় করি। সিঁদুরে মেঘ দেখলে যেমন গরুরা ভয় পায়। কারণ, এ ব্যাপারে, আমাদের অভিজ্ঞতা তো মোটেই ভালো না। এই ভয়ের কথাটাই তোমাদের বলতে চাইছিলাম।'

অজয় তাকাল মধুসূদনের দিকে। মধুসূদন আড় চোখে অজয়কে একবার দেখল। অজয় বিমর্ষ মুখে, অমৃতার দিকে তাকিয়ে বলল,

'তোমার কথা শুনে, ক্রমেই যেন কেমন জুড়িয়ে যাচ্ছি। কোথায় একটু আনন্দ করবো বলে বেরোলাম। আর এ সময়ে তুমি যদি ভয়-টয়ের কথা এভাবে বলতে থাকো—।'

অমৃতা হেসে উঠে বলল, 'আমি তোমাদের আনন্দে মোটেই বাধা দিতে চাই না, বরং সঙ্গ দিতে চাই, ভয়ের কথাটা আসলে তো বুঝতেই পারছ, কেন বলেছি। যাই কর, তা যেন তোমাদের আনন্দ করার মধ্যেই বজায় থাকে। তা যেন তোমাদের কারোরই শরীরের বা মনের পক্ষে গ্লানিকর কিছু না হয়ে ওঠে।'

মধুসূদন বলল, 'তার জন্য তো তুমি আমাদের সঙ্গে আছ।'

অমৃতা বলল, 'তার মানে ? আমি তোমাদের সঙ্গে আছি কি তোমাদের সামলাবার জন্য ? মোটেই না। ও সব নিয়ে যে জোর চলে না, তাও আমি অনেক দেখেছি। আমি তোমাদের আনন্দের ভাগীদার হতে চাই, আর তা হতে চাই পরিচ্ছন্ন ভাবে।'

মধুসূদন বলল, 'আমরাও তাই চাই। কী বলিস রে অজয় ?'

অজয় বলল. 'নিশ্চয়! আমরা মোটেই কেউ রাগী ষাঁড়ের মতো একলা থাকতে চাই না। আমরা যূথবদ্ধ সামাজিক জীবের মতো সবকিছু ভোগ করতে চাই।'

মধুসূদন হেসে বলল, 'টপ্।'

অমৃতা হাসল যদিও কারো দিকে তাকালো না। কিন্তু বোঝা গেল, ও খুশি হয়েছে। তারপরেই যেন হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেছে, সেরকম একটা কৌতূহলিত চোখে অজয়ের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'এবার পাটনায় এসে সুনন্দার কথা কিছু শুনলাম না তো ? ওর খবর কী ?' অজয় যেন অবাক হয়ে বলল, 'আমাকে জিজ্ঞেস করছ নাকি ? আমি তো তোমাদের সঙ্গেই পাটনায় এসেছি, কেমন করে জানব ?'

মধুসূদন বলে উঠল, 'আমাদের সঙ্গে পাটনায় এলেও, সুনন্দার সঙ্গে

তোরই আগে যোগাযোগ হওয়ার কথা। আমরা তো এসেছি পরশু, এর মধ্যে একদিনও কি তুই সুনন্দাদের বাড়িতে যাসনি ?'

অজয় যেন কিছুটা অপ্রস্তুত ভাবে হাসল, বলল, 'গেছলাম।'

অমৃতা হেসে, চোখের পাতা কাঁপিয়ে বলল, 'এত কথা বলছ, কিন্তু একবারও সে কথাটা বলছ না তো ? কবে গেছলে ?'

অজয় বলল, 'কাল সকালে গেছলাম। তোমরা এসেছ, সে কথা বললাম।'

মধুসূদন বলল, 'এটা তোর খুবই অন্যায় অজয়। অবশ্য আমিও মনে করতে পারলে, সুনন্দার বাড়ি একবার ঘুরে আসা যেত।'

অমৃতা বলল, 'হ্যাঁ, আমি তেমন খেয়াল করিনি। আমার দিকটা বিবেচনা কর। আমি বাপের বাড়ি এসেছি, বাড়ির সকলের মধ্যে থেকে, এতটা খেয়াল করতে পারিনি। কিন্তু এখন তো আমিই কথাটা মনে করলাম।'

অজয় বলল, 'এখন গেলেও, সুনন্দা নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে দরিয়াগঞ্জে আসত না।'

অমৃতা বলল, 'তা কেন আসবে ? অজয় মজুমদার আগে সুনন্দাকে বিয়ে করুক, তারপর তো। একজন অবিবাহিতা মেয়েকে তার ভাবী স্বামীর সঙ্গে দরিয়াগঞ্জ ক্লাবে যেতে দিতে দেবে কেন ?'

মধুসূদন বলল, 'তার আগে অজয়কে জিজ্ঞেস কর। বিয়ের দেরী আর কত ?'

অমৃতা জিজ্ঞাসা না করে, জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল অজয়ের দিকে। অজয়ের মুখের হাসিতে ঠিক অপ্রস্তুত ভাব নয়, যেন একটা অস্বস্তিও রয়েছে। বলল, 'তা আমি কী করে বলব, কবে বিয়ে হবে ? বিয়ের কথা কি কেউ বলতে পারে ?'

অমৃতা ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'ঠিক কবে বিয়ে হবে, সে-কথা হয়তো বলা যায় না। কিন্তু কতদূর এগোল, সেটা তো বলা যায়।'

মধুসূদন বলল, 'আর এ তো সম্বন্ধ দেখে বিয়ে নয়। প্রেমজ। তাই নয় কি অমি ?' এই মুহূর্তে অমৃতার মুখে কি একটু অস্বস্তির ছায়া পড়ল ? তবু ও হেসে বলল, 'আমি তো তাই জানি।'

অজয়ের মুখ যেন ঈষৎ গম্ভীর হল, বলল, 'প্রেম কাকে বলে, আমি জানি না ভাই। তবে হ্যাঁ, সুনন্দার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয়েছে। আমি ওদের বাড়িও অনেকবার গেছি, ব্যাপারটা এই পর্যন্তই এগিয়ে আছে। কিন্তু ফাইনাল কিছু হয়নি।'

অমৃতা আর মধুসূদন পরস্পরের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। মধুসূদন বলল, 'ব্যাপারটা কেমন ঘোলাটে মনে হচ্ছে। আমি তো যতদূর জানি, সুনন্দাদের বাড়ির লোকেরা তোর মতামতের উপরেই নির্ভর করে আছে। আরও যতদূর জানি, তোর বাড়ির লোক—মানে, তোর বাবা মা'র কোন আপত্তি নেই। তবে বিয়েটা এখনো আটকাচ্ছে কোথায় ?'

অজয় কোন কথা না বলে, সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। অমৃতা আর মধুসূদনের মধ্যে আর একবার দৃষ্টি বিনিময় হল। মধুসূদন আবার বলল, 'কী রে অজয় চুপ করে রইলি যে এর মধ্যে কিছু ঘটেছে নাকি ?'

অজয় হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'ঘটবে আবার কী ? সময় হলেই হবে।'

অমৃতা মাথা নেড়ে বলল, 'না, আমার কাছে ব্যাপারটা তেমন সুবিধের ঠেকছে না। মধু, কালই একবার আমি সুনন্দাদের বাড়ি যাব। সুনন্দার কাছ থেকেই শোনা যাবে, ব্যাপারটা কী'।

অজয় হেসে উঠে বলল, 'তোমরা দুজনে কি এখন নতুন করে আমার বিয়ের ঘটকালি করবে নাকি ?'

অমৃতা বলল, মোটেই নয়, এ বিয়েতে আবার ঘটকালির কী আছে ?

এ বিয়ে ঠিক হয়েই আছে, আমরা জানি। কিন্তু ঠেকে আছে কেন, সেটাই জানতে চাই।'

অজয় বলল, 'এ তো আর অমৃতা মধুসূদনের বিয়ে নয়, কথা হয়ে গেল ব্যাস্। বিয়েও হয়ে গেল। তোমাদের হল খাঁটি প্রেমজ বিয়ে। সুনন্দার সঙ্গে আমার ব্যাপারটা কি ঠিক তাই বলা যায়?'

মধুসূদন ভ্রূ কুঁচকে আগে একবার অমৃতাকে দেখে নিল, তারপরে বলল, 'ঠিক তাই বলা যায় মানে? তুই নিজেই আমাদের কাছে বছর খানেক আগে স্বীকার করেছিলি, সুনন্দাকে তুই বিয়ে করবি। করিসনি?'

অজয় বলল, 'করেছিলাম। কিন্তু আমার আপত্তি হচ্ছে প্রেমজ শব্দে। আমি ঠিক সেই অর্থে সুনন্দার সঙ্গে কখনো প্রেম করিনি।'

অমৃতা হেসে বলল, 'কিন্তু সুনন্দা যে তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল, সে-কথা তো আমি জানতাম অজয়।'

অজয় হাসল না, বলল, 'সুনন্দা আমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল, এ কথাটা তুমি হয়তো যতটা জানো, আমি ততটা জানি না। আমার কথা বলতে পারি, সুনন্দা মেয়েটি ভালো। পাটনায় থাকতে তোমাদের মতো ওদের বাড়ি আমারও যাতায়াত ছিল। ওর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয়েছিল, আমি তখন সম্মতিও দিয়েছিলাম, এর বেশি আমি কিছু বলতে পারছি না।'

লক্ষ্য করবার বিষয়, এবার অমৃতা মধুসূদনের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল না। যদিও মধুসূদন অমৃতার দিকে তাকিয়ে ছিল অমৃতা যেন একটু কুণ্ঠিত ভাবেই অজয়কে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি আমার ওপর রেগে যাচ্ছ নাকি?'

অজয় সচকিত হয়ে হেসে উঠল, বলল, 'মোটেই না। আমি তোমার ওপর রাগব কেন?'

মধুসূদন মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হুঁ, কোথায় যেন একটা গোলমালের সুর বাজছে। তুই কিছু মনে করিস না অজয়, সুনন্দার কি অন্য কোথাও বিয়ে ঠিক হয়েছে নাকি?'

অজয় এবার বিরক্ত স্বরে বলল, 'হ্যাঁ, আমি একজন প্রত্যাখ্যাত প্রেমিক, একটি রোগ এলিফ্যান্ট, হয়েছে? আগামীকাল তুই আর অমি গিয়ে জেনে আসিস।'

মধুসূদন একটু যেন থতিয়েই গেল। অমৃতার দিকে অবুঝ জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। অমৃতা বলল, 'আমার অবশ্য উল্টোটাই মনে হচ্ছে। বোধহয় অজয়ই পেছিয়ে আসছে।'

মধুসূদন জিজ্ঞেস করল, 'এ রকম মনে হবার কারণ? অবশ্য অজয় আমাদের বন্ধু বলেই, ওর সামনেই কথাটা জিজ্ঞেস করছি।'

অমৃতা বলল, 'তা জানি না। আমার মনে হল, বললাম।'

অজয় যেন একটু প্রসন্ন হাসল, তারপরে বলল, 'এ সব কথায় দরকার কী? কোথায় একটু আনন্দ করতে বেড়াতে বেরিয়েছি, তা নয়, যত সব বাজে কথা।'

মধুসূদন বলল, 'ঠিক আছে, আগামীকালই সব জানা যাবে।'

অজয় বলল, 'জানিস। অমি, আমি একটা সিগারেট খেতে পারি?'

অমৃতা বলল, 'একটা নয় একশোটা।'

অজয় হেসে কোটের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল।

এপর্যন্ত আপনারা একটা বিষয় অবগত হলেন। যে অমৃতাকে আমরা দেখেছি অজয়ের সঙ্গে দেখা করতে আজকাল ঘৃণা বোধ করে, অনধিক তিন বছর আগেও, ওদের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। ওদের দরিয়াগঞ্জের ক্লাবে যেতে দিন। ইতিমধ্যে চলুন, আমরাও বছর ছয়েক পিছনে যাই। অর্থাৎ, মধুসূদনের সঙ্গে অমৃতার বিয়ের বছর খানেক

আগে। অথবা আমরা আরও দু-এক বছর পিছনে যেতে পারি। যখন এই পাটনা শহরেই মধুসূদন আর অজয়, ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজিতে এম. এ. পড়ত।

ইতিমধ্যে ঘটনায় ও সংবাদে আপনারা জেনে নিয়েছেন, অজয় পাটনা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করে। এখন আপনাদের বলা দরকার, অজয়ও মধুসূদনের শহরেরই প্রবাসী বাঙালী পরিবারের ছেলে। অজয়দের বাড়িও সেই জেলা শহরেই। ওরা ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে জেলা শহরের স্কুলে পড়েছে। সেখান থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে দুজনেই পাটনায় গিয়েছিল উচ্চশিক্ষার জন্য। মধুসূদনের মামার বাড়ি পাটনায়। অজয়ের বড় মাসীমার বাড়িও পাটনায়। একজন মামার বাড়ি আর একজন মাসীমার বাড়ি থেকে পাটনায় পড়াশোনা করেছে। কেবল এম. এ পাশ করেনি, পাটনা ল' কলেজ থেকে দুজনেই আইন পাশও করেছিল!

কিন্তু নিতান্ত ঘটনা আপনাদের আমি শোনাব না, গুনগুন করার চেয়ে, আমি যথাস্থানে, যথাযথ পাত্রপাত্রীদের সামনেই আপনাদের হাজির করাতে ভালবাসি। পাটনা ইউনিভার্সিটির দুটি-জুয়েল ছাত্র, যারা ইংরেজি ভাষায় এম. এ. পড়ছে, তাদের দেখুন। দুজনেই শহরের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে। সিগারেট টানছে দুজনেই। এখনকার সঙ্গে চেহারার, দুজনেরই বেশ কিছু অমিল। দুজনেই নতুন গোঁফ রাখতে শিখেছে, আর সে গোঁফ জোড়া কতটা সূক্ষ্ম আর সুন্দর করা যায়, সে-চেষ্টাও ধরা যাচ্ছে।

সিভিল লাইনের কাছাকাছি অঞ্চলেই, পাটনা ইউনিভার্সিটির ইংরেজি ভাষার সিনিয়র অধ্যাপক তারকেশ্বর চক্রবর্তী বাস করেন। তারকেশ্বর চক্রবর্তী দুই পুরুষের পাটনা প্রবাসী। তাঁর বাবা এখানে চাকরি উপলক্ষে দীর্ঘকাল ছিলেন। এখানেই রিটায়ার করেন। এখানেই তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের, শেষ দিকে শিক্ষা, বিবাহাদি দিয়েছেন।

এবং তাঁর স্বর্গলাভ ঘটেছে এই পাটনার গঙ্গাতীরেই। তারকেশ্বর চক্রবর্তীরা তিন ভাই। কিন্তু তিনজনেই আলাদা বাড়িতে থাকেন, এবং সকলেই প্রতিষ্ঠিত। তারকেশ্বর পৈতৃক বাড়ির দাদাদের অংশ, তাঁদের কাছ থেকে যথার্থ মূল্যে কিনে নিয়েছেন। দাদারা কোন আপত্তি করেননি। যে-যাঁর অংশ ভাইকে বিক্রি করে দিয়ে, পাটনা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে বাড়ি করেছেন।

সময়টা প্রায় সন্ধ্যা। মধুসূদন আর অজয়, তারেকশ্বর চক্রবর্তীর বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল। যে সময়ের ঘটনা, তখনও চক্রবর্তী বাড়ির বাইরের দরজায় কলিং বেল ছিল না। কড়া নাড়লে কেউ না কেউ ভিতর থেকে দরজা খুলে দিত।

মধুসূদন বলল, 'কড়াটা নাড়।'

অজয় বলল, 'তুই নাড়।'

'কেন, তোর নাড়তে কী হয়েছে?'

'আমার আর তোর মধ্যে ফারাক আছে। তুই পয়া।'

'তার মানে?'

'তার মানে কিছু নেই। দেখেছি, তুই যেদিন কড়া নাড়িস, সেদিন বিশেষ একজন এসে দরজা খুলে দেয়।'

'ইয়ারকি করিস না। পরশু তো স্যার নিজেই দরজা খুলে দিয়েছিলেন। কড়া নেড়েছিলাম আমি।'

অজয় হেসে বলল, 'আর আমি নাড়লে অধিকাংশ দিন বাড়ির ঝি এসে দরজা খুলে দেয়।'

'রাসকেল।'

'রাসকেল বলিস আর যা-ই বলিস, তোর পয়া হাতেই কড়াটা নাড় না।'

মধুসূদনই দরজার কড়া নাড়ল। একটু পরেই দরজা খুলে গেল। দেখা গেল তিরিশ বছরের এক যুবককে।

সে হেসে বলল, 'এই যে মানিকজোড়, এসো, ভেতরে এসো।'

মধুসূদন জিজ্ঞেস করল, 'স্যার আছেন নাকি তপনদা ?'

তপন নামে যুবক দরজার পাশে সরে দাঁড়িয়ে বলল, 'বাবা না থাকলে কি তোমাদের আসতে বারণ ? এ বাড়িতে তো তোমাদের অবারিত দ্বার।'

অজয় বলল, 'সেজন্য নয়, এমনি জিজ্ঞেস করছি।'

আশা করি তপনের পরিচয়টা বুঝে নিতে আপনাদের অসুবিধে হল না। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির সিনিয়ার অধ্যাপক তারকেশ্বরের মধ্যম পুত্র তপন চক্রবর্তী। তাঁর মানিকজোড় সম্বোধনের কারণটাও স্পষ্ট। যেখানেই যায়, মধু আর অজয়, একসঙ্গে। এ বাড়িতেও তারা একসঙ্গেই যাতায়াত করে। তপন বলল, 'বাবার কাছে ইউনিভারসিটিরই দ্বিবেদীজী আর উপেন্দ্র প্রসাদ বাবু এসেছেন। চল, আমরা অন্য ঘরে গিয়ে বসি।'

মধুসূদন আর অজয় বাড়ির মধ্যে ঢুকল। দরজাটা দেখলে বোঝা যায় না, বাড়ির সামনেই এতখানি খোলা জায়গা এবং বাগান আছে। দেখতেই পাচ্ছেন, বাগান মানে তথাকথিত বাগিচা নয়। গন্ধরাজ কামিনী টগর বেল যুঁই কৃষ্ণকলির ঝাড়ও কিছু আছে। বিহারেই হোক, আর বাঙলাদেশেই হোক, বাঙালীরা সব জায়গায় প্রায় এক রকমই থাকেন। দেখুন, কিছু সবজীর চাষ আছে, লাউ কুমড়োর মাচা করা হয়েছে। সচরাচর এ দেশে যা জন্মায় না, তারকেশ্বরের

বাবা যে চারটি নারকেল গাছ লাগিয়ে গেছলেন তারাও এখন ফলবতী। এমন কি, দুটি সুপারি গাছও মাথা তুলে রয়েছে। তবে আমি না দেখিয়ে দিলেও বোধহয় আপনাদের চোখে পড়েছে, গোটা চারেক জবাফুলের গাছও রয়েছে। এটাকেও আপনারা বাঙালীর বৈশিষ্ট্য বলতে পারেন।

এত গাছপালার মধ্যেও, সামনের চত্বর বা উঠোন অনেকখানিই ফাঁকা। বাঁদিকে একটি টালির বড় ঘর। ওটিই এ বাড়ির বৈঠকখানা ঘর। তার সংলগ্ন একটি ছোট শিবমন্দিরও রয়েছে। আসল একতলা বাড়িটি দরজা দিয়ে ঢুকলে মুখোমুখি, একতলা বাড়িটির ভিতরে অনেক কয়েকটি ঘর। বারান্দা দিয়ে সামনে উঠেই একটি বড় ঘর। সেই ঘরটিও এক রকমের বাইরের ঘরই বলা চলে। চেয়ার, টেবিল, তক্তপোষ সবই আছে। গোটাকয়েক বইয়ের আলমারি। আধুনিক সাজসজ্জা না থাকলেও, এ ঘরের দরজা জানালায় পর্দা খাটানো দেখতে পাচ্ছেন। টেবিলের ওপরে এমব্রয়ডারির সূক্ষ্ম আর রুচিশীল কাজ করা ঢাকনা রয়েছে। তক্তপোষের ওপর বিছানো রয়েছে একটি পরিচ্ছন্ন হলুদ বেডকভার। চেয়ার টেবিলও বেশ ঝকঝকে, দেখলেই বোঝা যায় এ ঘরে পড়াশোনা চলে।

বাগানের টালির চাল বৈঠকখানা ঘরে তারকেশ্বর তাঁর ইউনিভার্সিটির সহকর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। মধুসূদন আর অজয় একতলা বাড়ির সামনের ঘরটিতে ঢুকল তপনের সঙ্গে। ওদের দুজনের কাছে এ বাড়ির কিছুই অচেনা না। অনেকবারই বাড়ির ভেতরেও গিয়েছে। তপন বলল, 'তোমাদের একটু চা চলবে তো?'

মধুসূদন আর অজয় হাসল। তপন বাড়ির ভিতরের দালানের দরজায় পা বাড়িয়ে বলল, 'বুঝেছি। দেখ, কপালে থাকলে হয়তো

চায়ের সঙ্গে টা-ও কিছু জুটে যেতে পারে!' বলে ভিতরের দিকে ঢুকে গেল, এবং তার ডাক শোনা গেল, 'বউদি, বউদি, মানিকজোড় এসেছে। ওদের একটু চা দিও। আমাকেও দিও, আমি বাথরুম থেকে আসছি।'

মধুসূদন একটা টেবিলের কাছে গিয়ে, কলকাতার মফস্বল সংস্করণ আনন্দবাজার পত্রিকাটি তুলে নিল। অজয় তখন দালানে ঢোকবার দরজার দিকে ঘনঘন তাকাচ্ছিল। তার চোখ মুখে একটা উৎসুক প্রত্যাশা। সে আনমনে টেবিলের ওপর থেকে আগের দিনের কলকাতা সংস্করণ আনন্দবাজার পত্রিকাটা তুলে নিল। যদিও মধুসূদনের মতো তার পত্রিকায় মনোযোগ আদৌ নেই।

দালানের দরজা দিয়ে আর একজন প্রায় পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর বয়সের পুরুষ বেরিয়ে এলেন। ধুতি পাঞ্জাবী পরা। গোঁফ আছে। এসেই তিনিও তপনের মতোই বললেন, 'মাণিকজোড়ের খবর কী? পড়াশোনা কেমন চলছে?'

মধুসূদন আর অজয় দুজনেই সচকিত হয়ে উঠল। মধুসূদন বলল, 'তীর্থংকরদা, ভেবেছিলাম আপনি এতক্ষণে আপনার পুরনো আড্ডায় চলে গেছেন?'

তীর্থংকর বললেন, 'সেখানেই যাচ্ছি। বেরোবার মুখে তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তা তোমরাও তো আমাদের পুরনো আড্ডায় অনেক দিন আসোনি। মনে রেখো, আমাদের মগধ ক্লাবই হচ্ছে বর্তমান বিহারের সব থেকে বেশি প্রগতিশীল আখড়া। তোমাদের সেখানে নিয়মিত যাওয়া উচিত।'

আপনারা বোধহয় ঠিক তীর্থংকরকে চিনতে পারছেন না। ইনি

হচ্ছেন তারকেশ্বরের সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র তীর্থংকর চক্রবর্তী। ইনি ইতিমধ্যে, ইংরেজিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে, ইউনিভারসিটিতেই আপাতত লেকচারারের পদে আছেন। চিন্তা ভাবনার দিক থেকে যাকে বলে প্রগতিশীল, ইনি পুরোপুরি তাই। ওঁরই চেষ্টায় পাটনার বুকে যুবক আর তরুণদের নিয়ে মগধ ক্লাব গড়ে উঠেছে। মগধ ক্লাবের ওপর পুলিশেরও কিছুটা নজর আছে, এটা সকলেই জানে। কারণ, সেখানে বামপন্থী রাজনীতির চর্চা চলে। বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আলোচনা।

মধুসূদন বলল, 'আমার যেতে খুব ইচ্ছে করে। অজয় যেতে চায় না।'

তীর্থংকর হেসে বললেন, 'প্রাণের টান থাকলে, সঙ্গীর জন্যে অপেক্ষা করতে হয় না।'

অজয় অসন্তুষ্ট স্বরে বলল, 'তুই তো মধু বেশ বাজে কথা শিখেছিস? আমি আবার কবে মগধ ক্লাবে যেতে চাইনি?'

মধুসূদন কিছু বলতে যাচ্ছিল। তীর্থংকর হেসে হাত তুলে বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোমাদের আর নিজেদের মধ্যে ও নিয়ে বাদানুবাদ করতে হবে না। ইউ টু আর অলওয়েজ ওয়েলকাম টু আওয়ার ক্লাব। তোমরা বস, ওরা আসছে।' বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন!

আপনারা যাকে সংস্কৃতিবান প্রগতিশীল বলেন, তীর্থংকরের মধ্যে সেই পরিচয় কিছুটা পেলেন। তপনও তার দাদার ভক্ত। সেও ইতিমধ্যেই অঙ্কে এম. এ. পাশ করে, কলেজে পড়াচ্ছে। তীর্থংকর বিবাহিত। তপন বউদি বলে যাকে ডাকছিল, তিনি তীর্থংকরেরই স্ত্রী। তীর্থংকর

ইতিমধ্যেই, দুটি সন্তানের জনক। আপনাদের আর একটি সংবাদও দিয়ে রাখা উচিত। তারকেশ্বর প্রথম জীবনে গান্ধীবাদী ছিলেন, অসহযোগ আন্দোলনে বছর দুয়েক জেলেও ছিলেন। যে সময়ের কথা বলছি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এবং দেশবিভাগ বা স্বাধীনতার পরবর্তী কালের কথাই বলুন, সেই সময় থেকে তিনিও পাশ্চাত্যের সমাজতান্ত্রিক ধ্যান ধারণায় অনেকখানি বিশ্বাসী।

তীর্থংকর বেরিয়ে যেতেই, অজয় বেশ ঝেঁজে বলল, 'তুই মিথ্যে কথা বললি কেন?'

'মিথ্যে কোথায়? তুই তো বলিস, ও সব রাজনীতি-টাজনীতির মধ্যে তুই নেই।'

'রাজনীতির মধ্যে না থাকা আর মগধ ক্লাবে না যাওয়া কি এক কথা?'

'ছ্যাখ অজয়, শুধু শুধু, ঝগড়া করিস না। তুই নিজেই বলেছিস, মগধ ক্লাবে পুলিসের নজর আছে।'

অজয় কিছু জবাব দেবার আগেই, একটি অষ্টাদশী মেয়ে ঢুকল। চিনতে পারছেন। না চেনার কোন কারণ নেই। অমৃতার চেহারায় খুব একটা পরিবর্তন বোধহয় হয়নি। অষ্টাদশী বলাটাও বোধহয় ভুল হল। ও উনিশ পার হতে চলেছে। ও এখন বি. এ. পড়ছে। ওরও ইংরেজিতে অনার্স।

আপনারাই লক্ষ্য করুন, মধুসূদন আর অজয় যেন মুহূর্তেই ঝগড়া বিবাদ ভুলে গেল।

অমৃতা এসে হেসে বলল, 'কী ব্যাপার, কী নিয়ে কথা হচ্ছে?'

অজয় তাড়াতাড়ি মধুসূদনের দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করল,

যেন ও ওদের কথাবার্তার প্রসঙ্গ না উচ্চারণ করে। সে নিজেই বলল, 'এই তোমাদের কথাই হচ্ছে।'

অমৃতা অবাক হেসে বলল, 'আমাদের কথা? আমাদের নিয়ে আবার কী কথা?'

অজয় হঠাৎ কোন কথা খুঁজে পেল না। জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল মধুসূদনের দিকে। মধুসূদন বন্ধুর মান রক্ষা করল উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে, 'তোমাদের মানে, তীর্থদা কয়েকটা কথা বলে গেলেন, তাই নিয়েই কথা হচ্ছিল। তার মানেই তোমাদের নিয়ে কথা হচ্ছিল।'

অমৃতার চুলে একটি দীর্ঘ বিনুনি। এমন কি শাড়ি পরার ধরনটিও তথাকথিত বাঙলা আটপৌরে ঢঙে। আজকাল যেমন দেখা যায়, মেয়েরা বাড়িতেও শাড়ি কুঁচিয়ে বা ফেত্তা দিয়ে পরে, সে রকম না। ওর হাতে একটি থালা। দেখে এবং গন্ধেই বোঝা যাচ্ছে, থালায় রয়েছে সদ্য ভাজা গরম সিঙাড়া, তার সঙ্গে গোটা কয়েক প্যাঁড়া। অমৃতা টেবিলের ওপর থালাটা রেখে বলল, 'বউদি পাঠিয়ে দিলেন। আপনারা খান আমি চা নিয়ে আসছি।'

অজয় বলল, 'এগুলো খাওয়া হোক, তারপরে তো চা। এক্ষুণি চায়ের জন্য ছোটবার দরকার কী?'

অমৃতা হাসল, তাকাল মধুসূদনের দিকে, বলল, 'তার মানে অজয়দা চান, আমি এখন এখানেই বসে থাকি, তাই তো?'

মধুসূদন বলল, 'অসুবিধে না হলে, দু' মিনিট বসতে আপত্তি কী?'

অমৃতা বলল, 'দু মিনিটের জায়গায় দশ মিনিট বসা যাবে, চা-টা নিয়ে আসতে পারলে।'

অজয় বলল, 'তাহলে দু'মিনিট স্যাক্রিফাইস করা যায়।'

অমৃতা বলল, 'সত্যি'? ওর দুই চোখে কৌতুকের ছটা, মুখ ফিরিয়ে মধুসূদনের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'দেখছেন তো মধুদা, সময় বিশেষে অজয়দা কী বলবেন, কথা খুঁজে পান না। আবার এক এক সময় প্রচুর কথা জিভের ডগায় এসে থাকে।'

মধুসূদন হেসে বলল, 'ওটা হল এক একজনের বৈশিষ্ট্য। ঠিক সময়ে ঠিক কথাটা খুঁজে পায়। কিন্তু বউদি কি জানতেন আমরা আসছি?'

অমৃতা ঘাড়ে ঝটকা দিয়ে মুখ ফিরিয়ে ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'তার মানে?'

মধুসূদন টেবিলের ওপরে রাখা থালা থেকে একটি সিঙাড়া তুলে নিয়ে বলল, 'আসতে না আসতেই গরম সামোসা, তাই জিজ্ঞেস করছি।'

অমৃতা স্পষ্ট বলল, 'আপনাদের জন্য মোটেই হয়নি। বড়দার জন্যই বউদি তাড়াতাড়ি সিঙাড়া করেছেন। আপনারা এসেছেন শুনে, পাঠিয়ে দিলেন।'

অজয়ও একটি সিঙ্গাড়া হাতে নিয়ে বলল, 'তীর্থদার ভাগ্যে আমাদের কপালে জুটে গেল।'

মধুসূদন বলল, 'ভুল বললি অজয়। যে-যার ভাগ্যে খায়, কারোর ভাগ্যে কেউ না।'

অজয় বলল, 'আমি মানি না।' বলে অমৃতার দিকে তাকাল।

অমৃতা হেসে জিজ্ঞেস করল, 'অজয়দা কি এ বিষয়ে আমার মতামত চাইছেন? আমি অবশ্য মধুদাকেই সমর্থন করি।' বলেই ও দালানের দরজা দিয়ে ভিতরে চলে গেল।

অজয় সিঙাড়ায় কামড় বসাতে গিয়ে, থমকে মধুসূদনের দিকে তাকাল, বলল, 'আমি দেখি, অমি তোকেই বেশি ব্যাপারে সাপোর্ট করে। কেন বল তো ?'

মধুসূদন সিঙাড়া চিবোতে চিবোতে বলল, 'আমার ধারণা, অমি তোকেই বেশি সাপোর্ট করে।'

'মোটেই না। এই তো দেখলাম।'

'আমি আবার অন্য সময় দেখিয়ে দেব।'

'কিন্তু এক এক সময় আমার মনে হয়, অমি তোর প্রতি একটু ইয়ে।'
'সেটা আমারও মনে হয়।'

দুজনেই হেসে উঠল। অজয় সিঙাড়ায় কামড় দিয়ে বলল, আমি সিরিয়াসলি বলছি। ও যখন তোর দিকে তাকিয়ে কথা বলে, তখন ওকে অন্য রকম দেখায়। আর আমার সঙ্গে আর এক রকম।'

'ওটা তোর দেখার ভুল। অমি আমাদের দুজনকেই এক রকম চোখে দেখে।'

কন্তু মানিকজোড় বলে না।'

'কী করে বলবে ? ও তো আমাদের থেকে ছোট।'

'কী জানি, হয়তো আমারই ভুল। কিন্তু অমি যেন আমাকে তেমন পাত্তা দিতে চায় না।'

'কী করে বুঝতে পারিস ?'

'আমার মন বলে। আমার মন আরো বলে, তোর প্রতিই ওর ঝোঁক বেশি।'

'ঝোঁকটা আবার কী?'

'ঝোঁক বুঝিস না? কচি খোকা তুই? প্রেম—প্রেম—বুঝলি প্রেমের ঝোঁক।'

মধুসূদন হো হো করে হেসে উঠল। আর তার হাসির মধ্যেই অমৃতা দু' কাপ ধূমায়িত চা নিয়ে ঢুকল, জিজ্ঞেস করল, 'এত হাসির কী হল?'

মধুসূদন বলল, 'এবার অবশ্য আমাদের নিজেদের কথা নিয়েই হাসা-হাসি হচ্ছিল।'

অমৃতা চায়ের কাপ দুটো টেবিলের ওপর রেখে বলল, 'খুবই গোপনীয় কথা বুঝি?'

অজয় তাড়াতাড়ি বলল, 'হ্যাঁ, মধুর একটা গোপনীয় কথা।'

অমৃতা তাকাল মধুসূদনের দিকে। মধুসূদন অজয়ের দিকে তাকিয়ে বলল 'কার গোপনীয় কথা, তাহলে বলেই ফেলি। তুই যখন আমার নামটাই বললি।'

অজয় ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে বলল, 'আরে, তুই আবার কী বলবি?'

অমৃতা মধুসূদনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'থাক, আপনাদের গোপন কথা আমার শোনার দরকার নেই।'

অমৃতার কথা শেষ হবার আগেই তপন ঢুকল। বোঝা গেল, সে

সিঙাড়া খেতে খেতেই ঢুকল। বলল, 'অমি, আমার চা-টা একটু নিয়ে আসবি ?'

অমৃতা বলল, 'খালি হাতে এলে, তবু চায়ের কাপটা নিয়ে আসতে পারলে না, ছেলেরা ভারি কুঁড়ে হয়।' বলে ও ভিতরে চলে গেল।

তপন বলল, 'তোমরা দাঁড়িয়ে কেন, বস।'

আপনারা যে-চিত্রটি আপাতত দেখলেন, বুঝতে কোন অসুবিধা নেই, মাণিকজোড়টির অধ্যাপকের বাড়িতে আসার আসল আকর্ষণটি কোথায়। অবশ্য অধ্যাপক সেটা জেনে শুনেই, ছাত্রদ্বয়কে অবারিত-দ্বার-আহ্বান জানিয়ে রাখেননি তাঁর আরও কোন কোন ছাত্র এ বাড়িতে আসে। বাঙালী অবাঙালী, সব রকমই। তার মধ্যে, সম্ভবত তারকেশ্বরের ছাত্র হিসাবে বিশেষ প্রিয়, এবং বাঙালী বলেই, তাঁর পরিবারের সঙ্গেও মধুসূদন আর অজয়ের ঘনিষ্ঠতা হয়েছে।

তারকেশ্বর বিপত্নীক। এ বাড়ির গিন্নি বলতে এখন তীর্থংকরের স্ত্রী, —বউদিও মধুসূদন আর অজয়কে প্রীতির চোখে দেখেন। তা ছাড়া লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন, এ বাড়ির পারিবারিক আবহাওয়ার মধ্যে যথেষ্ট উদারতা আছে লোক দেখানো তথাকথিত আধুনিকতা নেই, যাকে বলে ইঙ্গবঙ্গ আবহাওয়ার ঝলক। কিন্তু প্রকৃত উদারতা বলতে যা বোঝায়, তা আছে। সেটা শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক।

বর্তমানের অনেকখানি দেখিয়ে অতীতের বেশী চিত্রমালা মেলে দিয়ে লাভ নেই। আপনারা মোটামুটি একটা অতীত ও বর্তমানের ছবি এখন নিজেরাই এঁকে নিতে পারেন। আপনাদের কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক অমৃতাকে নিয়ে, মধুসূদন আর অজয়ের মধ্যে, জয়-পরাজয়ের দ্বন্দ্বটা কোন্ পর্যায়ে উঠেছিল, এবং কোন পরিস্থিতিতে অমৃতাকে মধুসূদন জয় করেছিল

আপনাদের বর্তমান মানবজাতির সভ্যতায় পিতৃতান্ত্রিক গৌরবেরই জয়জয়কার। স্বভাবতই মনে হতে পারে, নারীকে জয় করতে হলে, দুজন পুরুষকে প্রেমের দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতেই হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা হয়নি। মধুসূদনকে বেছে নিয়েছিল অমৃতা নিজেই। এই বেছে নেওয়ার মধ্যে নিশ্চয়ই, অমৃতার মনে কতগুলি প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল।

মধুসূদন আর অজয়ের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব যেমন আজও বর্তমান, দুজনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও ছিল, এবং আছে। লেখাপড়ায় ওরা দুজনেই ভালো ছিল। কিন্তু তার মধ্যে তারতম্যও কিছু ছিল। ভালোর মধ্যে যদি সীমারেখা টানা যায় তাহলে মধুসূদন অজয়ের থেকে কিছু উজ্জ্বল। অজয় নিজের লেখাপড়া ও আত্মচিন্তায় বা পরিবেশের বাইরে তার গতিবিধিকে বেশি চালিত করতে অক্ষম। সেই হিসাবে মধুসূদন অনেকটা বিস্তৃত, সে আত্মকেন্দ্রিক নয়।

অজয় যে অমৃতার প্রতি আসক্ত, সেটা ও সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে কোন কিছু প্রকাশ করতে পারেনি, অথচ ওর প্রেমের লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয়েছে অত্যন্ত স্থূল ভাবে। মধুসূদন এক্ষেত্রে সহজ ও স্বাভাবিক। রোমান্টিক চরিত্রের যা লক্ষণ, যে মুখে বেশি কিছু বলে না, কিন্তু 'দেহিপদপল্লবমুদারম্' ভাবটি চোখে মুখের হাসিতে ও আচরণে সর্বদাই ফুটে থাকে। প্রেমিকের আত্মসমর্পণের একটা বিশেষ ভঙ্গি আছে, যা চেষ্টাকৃত ভাবে করা যায় না, চন্দ্রকিরণের মতো আপনা থেকেই আলোকিত করে।

এর দ্বারা আমি বলতে চাই না, প্রেমিক হিসাবে অজয়ের অন্তরে কোন মালিন্য আছে। ওর প্রেমের মধ্যে ছিল একটা উগ্রতা এবং দাবী। সম্ভবত ওর মনে আর একটা ভাবনা, ওর জয়কে মনে মনে দৃঢ়তর করেছিল। ও ব্রাহ্মণ। মধুসূদন কায়স্থ। অজয় প্রায় নিশ্চিন্ত ছিল, ওর প্রার্থনা অমৃতা বা অমৃতার বাড়ি থেকে কখনো প্রত্যাখ্যাত

হবে না। আসলে ওর ভুল যেখানে, তা হল, অমৃতা-চরিত্র ও বুঝতে পারেনি। যাকে বলে ডমিনেটিং, অমৃতা ঠিক সেই চরিত্রের মেয়ে নয়। কিন্তু নিজের প্রতি ওর আস্থা ছিল। সব থেকে বড় কথা, হৃদয় যেখানে তরঙ্গায়িত হয় না, সেখানে সকলই বিফল। মধুসূদন অমৃতার অন্তরে সেই তরঙ্গের ঢেউ তুলতে পেরেছিল।

অজয় ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ ব্যাপারে যা ভেবেছিল, তারকেশ্বরের পরিবারে তার কোন মূল্য ছিল না। বর্ণের থেকেও, সেই পরিবারে মানুষের মূল্য বেশি। মনুষ্যত্ব এবং তার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের প্রতি তাঁদের বিশ্বাস বেশি। বর্ণগত বিচারের থেকেও তারকেশ্বরের পরিবার যে উদার মনোভাবের দ্বারা চালিত, তা আপনারা আগেই দেখেছেন বা বুঝেছেন।

অমৃতা অজয় ও মধুসূদনকে যেমন মনের কথা স্পষ্ট জানাতে দ্বিধাবোধ করেনি, তেমনি দ্বিধাবোধ করেনি, বউদিকে ওর মনের কথা জানাতে। এ সব ঘটনা যখন ঘটছিল, তখন মধুসূদন আর অজয়ের আইন পরীক্ষা শেষ। অমৃতা এম. এ. পাশ করেছে। তীর্থংকর স্ত্রীর কাছ থেকে বোনের মনের কথা জেনে, তারকেশ্বরকে বলেছিলেন। তারকেশ্বর নিজে অমৃতার সঙ্গে কথা বলে, মধুসূদনের সঙ্গে তার বিয়ের সম্মতি দিয়েছিলেন।

কিন্তু আপনাদের অবগতির জন্য জানাই, এই বিয়ে মধুসূদন বা অজয়ের মধ্যে কোন বিদ্বেষ বা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতে পারেনি। অথচ এমনটাই সচরাচর ঘটে থাকে। অবশ্য, অজয় প্রত্যাখ্যাত হবার পরে আমি দেখেছি, ও যেন সর্প দংশনের বিষ জ্বালায় মৃতপ্রায় হয়েছিল। একটা প্রচণ্ড সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, ওর জীবনটা একটা অস্বাভাবিকতার খাতে ভেসে যাবে। ও কিছুই সুস্থ ও সুস্থির ভাবে চিন্তা করতে পারত না। একটা উন্মাদনা ওকে কিছুদিন তাড়িয়ে

নিয়ে বেড়িয়েছিল। ও মাসীর বাড়িতে ভালো করে কারো সঙ্গে কথা বলতে পারত না। খেতে পারত না, ঘুমোতে পারত না। এমন কি মধুসূদনকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করত, এবং সেই সময়টা ও কয়েক দিন নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছে।

সৌভাগ্যের বিষয়, মনের এই বিকারের ভাবটা অজয় খুব তাড়াতাড়ি কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল। মধুসূদনকে ও সত্যি ভালোবাসত এবং বাসেও। ও একটা বিষয় ভালো করে অনুভব করেছিল। ঈর্ষা ওকে কিছুই দেবে না, জীবনের ক্ষতি করা ছাড়া। মধুসূদন ওর প্রতি কোন অবিচার করেনি। প্রেমের দ্বন্দ্বে যে কথাটা প্রচলিত আছে, যুদ্ধে আর প্রেমে কোন নীতি নিয়ম নেই, মধুসূদন আদৌ সে রকম পথে চলেনি। শঠতা প্রবঞ্চনা তো দূরের কথা. মধুসূদন অমৃতাকে মনে মনে প্রার্থনা করলেও, তার জন্য যে কোন কিছু করবার প্রয়াসী ও ছিল না। এ ক্ষেত্রে যদি ভাগ্যের কথা বলা যায়, তাহলে মধুসূদন খানিকটা সেই ভাবেই হাত পেতে দাঁড়িয়েছিল। অবশ্য প্রেমিক পুরুষের এটাও একটা লক্ষণ। জোর করে ছিনিয়ে সব সময় সব কিছু পাওয়া যায় না।

একটা কথা অবশ্য প্রচলিত আছে। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। সেই বীরত্ব ব্যাপারটাও ক্ষেত্রবিশেষে আপেক্ষিক নয় কী? বীরত্ব মানেই, সশস্ত্র হুংকার নয়। মধুসূদন একদিক থেকে বীর, কিন্তু সেটা ওর চরিত্রের গুণাবলী।

এ সময়েই সুনন্দার কথাটাও সেরে নেওয়া দরকার। সুনন্দা পাটনা প্রবাসী বাঙালী ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে। ওর বাবা পাটনা সচিবালয়ে চাকরি করেন। সুনন্দা অমৃতার বান্ধবী, ওরা একসঙ্গে পড়ত। অমৃতার মাধ্যমেই, সুনন্দার সঙ্গে মধুসূদন আর অজয়ের পরিচয়। অবশ্য সুনন্দাদের বাড়ির সঙ্গে, প্রবাসী বাঙালী হিসাবে, পরিচয় এমনি

একটা ছিলই। কিন্তু একটি মেয়ের সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচয়, সেটা কিঞ্চিৎ আলাদা ব্যাপার।

অমৃতার সঙ্গে যখন মধুসূদনের বিয়ে স্থির হয়ে গেল, সেই সময় অজয় কিছুদিন সুনন্দাদের বাড়ি যাতায়াত করেছে। সুনন্দাকে রূপের দিক থেকে, অমৃতার চেয়ে নিকৃষ্ট বলা যায় না কোনমতেই। কোমল সুন্দর পুতুলের যেমন একটা সৌন্দর্য আছে, সুনন্দা অনেকটা সেই রকম। অমৃতার কাছে ওকে যে-কারণে অনেকটা ম্লান দেখায়, সেটা ওর ব্যক্তিত্বের অভাব। এমন নয় যে, অমৃতা চোখে মুখে কথা বলে। তবু ওর ভিতরের একটা ঋজু ব্যক্তিত্ব অনুভব করা যায়, যা সুনন্দার মধ্যে অনুপস্থিত। আওপাতালি বলে একটা কথা আছে। সুনন্দা অনেকটা সেইরকম। ও নিজের ইচ্ছেয় চলতে পারে না। নিজে ভেবে কিছু বলতে পারে না। ওর নিজস্বতা বলতে, সম্পূর্ণ রূপেই পরিবারের প্রতি নির্ভরশীল। সেখানে ওর মতামতের যেমন কোন দাম নেই, ওর নিজের কোন মতামতও নেই।

অজয় যে সুনন্দার সঙ্গে প্রেম করতেই, ওদের বাড়ি যাতায়াত শুরু করেছিল, আসলে তা নয়। মিথ্যেই ও মনের একটা ফাঁক ভরাট করতেই যাতায়াত করেছিল। তার ফল হয়েছিল, সুনন্দাদের পরিবারে ও একটা আশা জাগিয়ে তুলেছিল। কারণ, পাত্র হিসাবে অজয়কে খারাপ বলা যায় না। তখন অজয়ের পরিচয় এম. এ, বি, এল। সুনন্দাকে ভালো ভাবে পাত্রস্থ করা ছাড়া, ওদের পরিবারে অন্যতর কোন ভাবনা ছিল না। অমৃতা মাঝে মাঝে যেমন স্বাধীন ভাবে জীবন যাপনের কথা বলত, সুনন্দা কলেজে লেখাপড়া শিখলেও, কখনও তার সে-রকম চিন্তা ছিল না।

অজয় কিছুদিন যাতায়াতের পরেই, দেখেছিল, সুনন্দার বাড়িতে তার খাতির আর আদর বাড়ছিল। ও ব্যাপারটা কিছু বুঝে ওঠবার

আগেই, সুনন্দার বাবা, অজয়ের বাবাকে চিঠি লিখে, অজয়কে জামাই হিসাবে প্রার্থনা করেছিলেন। কথাটা যখন অজয়ের কানে উঠেছিল, ও ওর মনের অবস্থা তেমন তলিয়ে দেখেনি। আপত্তি না করে বলেছিল, 'আগে কোর্টে প্র্যাকটিস্ শুরু করি, তারপরে।' অজয়ের কথা শুনে, ওর বাবাও সুনন্দার সঙ্গে বিয়ের সম্মতি দিয়েছিলেন।

কিন্তু যতই দিন মাস বছর অতিক্রম করছিল, অজয় অনুভব করছিল, সুনন্দাকে ও ভালোবাসে না। অবশ্য এক সময়ে মনে মনে ভেবেছিল, একটা ফাঁক ভরাট হবে। জীবনের সব ফাঁক, ইচ্ছে মতো ভরাট করা যায় না। ও কথাটা প্রাণ খুলে কাউকে বলতে পারছিল না। ফলে সুনন্দাদের বাড়িতে সংশয় সন্দেহ ও উদ্বেগের সঞ্চার হচ্ছিল।

যে সময়ের কথা বলছি, সেই সময়ে, মধুসূদন আর অমৃতার বিয়ের অনেক ক'টা বছর কেটে গেছে। মধুসূদন আর অজয়, দুজনেই জেলা শহরের কোর্টে প্র্যাকটিশ শুরু করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল। মধুসূদন দেওয়ানির দিকে গিয়েছিল, অজয় ফৌজদারি বেছে নিয়েছিল। এই যে দেখলেন, মধুসূদন, অমৃতা আর অজয় দরিয়াগঞ্জ চলেছে, এ ঘটনাটা বছরে বার দুয়েক ঘটে। ওরা একই জেলা শহরের অধিবাসী। পাটনার প্রতি দুজনেরই সমান আকর্ষণ এখনও বলবৎ। মধুসূদন এবং অমৃতার প্রীতি আর সখ্যতা সম্বন্ধও আপনারা একটু আগেই দেখলেন। মধুসূদন আর অমৃতা পাটনায় এলে, এখনও (অর্থাৎ বর্তমান থেকে অনধিক তিন-বছর আগে) অজয়কে ওরা সঙ্গে নিয়ে আসে। অজয়ও না এসে থাকতে পারে না। অবশ্য এখন ওদের পাটনায় আসার পথ পরিবর্তন হয়েছে। মধুসূদন আসে শ্বশুরবাড়ি, যদিও মামার বাড়িও যায়। অমৃতা আসে পিত্রালয়ে। অজয় তার অকৃত্রিম বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর সঙ্গী হিসাবে, মাসীর বাড়ি বেড়াতে আসে। সুনন্দাদের বাড়ি সে না যাবারই চেষ্টা করে। কারণ এদিকটা ওর জীবনে ক্রমেই ফ্যাকাসে হয়ে আসছে। অথচ

একটা আড়ষ্টতা বোধও আছে। এ নিয়ে ও বাড়িতে বাপ মায়ের কাছে এক রকম ঘোষণাই করে দিয়েছে, বিবাহে ওর মত নেই।

চলুন দরিয়াগঞ্জ ক্লাবে যাওয়া যাক। গঙ্গার ধারে ক্লাবটি সত্যি সুন্দর। সাহেবরা এ ক্লাব একদা তৈরি করেছিল তাদের নিজেদের জন্য। তখন নেটিভদের ও ক্লাবে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। স্বাধীন ভারতে আর সে কলঙ্কটা নেই। তবু এখনও, ভারতের বড় বড় অনেক শহরে, অনেক ক্লাবেই, ইচ্ছে করলেই যে কেউ মেম্বার হতে পারে না।

মধুসূদন আর অজয়ের অনেক কালের সাধ ছিল, ওরা দরিয়াগঞ্জ ক্লাবের মেম্বার হবে। তা ওরা হয়েছে। যদিও বছরে দু'একবারই মাত্র আসা হয়, তবু এর মধ্যে একটা সাধ পূরণের তৃপ্তি আছে।

গঙ্গার ধারে উন্মুক্ত লনে অনেকে বসেছে। ভিতরে রাজকীয় ব্যবস্থা আছে। বিলিয়ার্ড থেকে যাবতীয় যা থাকা উচিত, ক্লাবটিতে সবই আছে। তবে সব থেকে বড় আকর্ষণ গঙ্গাতীর আর তার খোলা হাওয়া।

এখন অবশ্য রাত্রের দিকে একটু ঠাণ্ডা পড়ে। তবু মধুসূদনরা বাইরের একটা টেবিলেই বসেছে। রাত্রি প্রায় ন'টা বাজে। দেখেই বুঝতে পারছেন, মধুসূদনের গোলাপী আমেজের থেকে অজয়ের ঘোরটা একটু বেশি। অমৃতা সামান্য ওয়াইন পান করেছে। কিছু খাবারও খাওয়া হয়েছে। মধুসূদন বিল সই করবার চেষ্টা করতেই, অজয় বাধা দিয়েছে। ইতিমধ্যে মধুসূদন এবং অমৃতা অজয়ের বিয়ে নিয়ে ওর পিছনেও লেগেছিল। অজয় প্রথম দিকে হাসলেও, ওকে এখন কেমন আচ্ছন্ন ক্লিষ্ট আর হতভাগ্যের মত দেখাচ্ছে। অজয়ের জেদে ওকেই মধুসূদন বিল সই করতে দিল। এমন কি বেয়ারাকে টিপস্ও সেই দিল। বলল, 'আমি যাতে শান্তি পাই, সেটা আমাকে করতে দাও।'

অমৃতা বলল, 'তা কর। কিন্তু তোমার হিসাব আছে কি কতটা খেয়েছ ?'

অজয় বলল, 'খুব বেশি তো খাইনি।'

মধুসূদন হেসে বলল, 'নিজের চোখেই বিলটা দেখ না, সই তো করছিস।'

অজয় এখন অন্য অজয়। বিলে সই করতে করতে বলল, 'কত খেয়েছি তা দেখে সই করতে হবে ? হতে পারে, এক আধ পেগ বেশি খেয়ে ফেলেছি।'

মধুসূদন আর অমৃতা চোখাচোখি করে হেসে উঠল। অজয় বিল সই করে বেয়ারাদের টিপস্ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তিনজনেই গিয়ে আগের মতো সামনের আসনে পাশাপাশি গাড়িতে বসল। মধুসূদন গাড়ি খানিকটা স্টার্ট করে এগিয়েই, হঠাৎ থামল, বলল, 'অমি, তুমি পান খেতে চেয়েছিলে, আমিও, খাব। অজয় খাবি নাকি ?'

অজয় পকেটে হাত দিয়ে বলল, 'না, পান খাব না, তুই আমার জন্য এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আসিস।'

জানি, দৈব, মায়া, ইত্যাদি শব্দগুলিকে জীবনের ক্ষেত্রে মেনে নিতে আপনারা সব সময়েই দ্বিধাবোধ করেন। যদিও এ বিষয়ে অভিজ্ঞগণের মতামত আলাদা। দেখুন মধুসূদন নেমে গেল, আর এত বছরের পুরনো বন্ধু অজয়, সহসাই কেমন ব্যাকুল অস্থিরতায় ভেঙে পড়ল, দু'হাতে জড়িয়ে ধরল অমৃতাকে, প্রায় আর্তস্বরে ডেকে বলল 'অমি, অমি, একবার, এক মুহূর্তের জন্য তুমি আমাকে ভালোবাস। এক মুহূর্তের জন্য তোমার আগুনের মতো স্পর্শ দিয়ে, আমাকে

একটা পোকার মতো জ্বালিয়ে দাও, এ্যাজ ইফ, ইট ব্রিংস মাই ডেথ ইনস্ট্যান্ট !'

অমৃতা ওর মনের অগোচরেও, এ রকম একটা ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। থাকা সম্ভবও না। অস্ফুট স্বরে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠল, 'অজয়, অজয় !'

হায়, মহাভারতে আপনারা যুধিষ্ঠিরের করুণ দীর্ঘশ্বাস শুনেছেন, পাঞ্চালীর কাছ থেকে প্রাপ্ত অতৃপ্ত প্রেমের জন্য। আরো অনেক ব্যাকুল বাসনামত্ত করুণ আর্জি শুনেছেন। কিন্তু অজয়কে দেখুন, যে ওর অবচেতনের সংবাদ উদ্ভাসিত মনের কোথাও ঘুণাক্ষরেও উদিত হতে দেখেনি। ও নিজেকেই চেনে না। প্রপঞ্চিত মায়াময় সংসারের এই এক আশ্চর্য নির্বন্ধ, সে জগতকে আবিষ্কার করতে যায়, কিন্তু নিজের কাছে নিজে থেকে যায় চির অনাবিষ্কৃত। অজয় যেন দুর্দম শিশুর মতো, অমৃতার সেই পরম রমনীয় বুকে হাত দিয়ে স্পর্শ করল, চকিতেই তাকে বুকের মধ্যে গভীর ভাবে টেনে, স্পর্শের ঘন সান্নিধ্যে, ঠোঁটে ঠোঁট স্পর্শ করল, বলল, অমি, অমি, জীবনে একবার, এক মুহূর্ত। আমি শুধু এই কারণেই বেঁচে আছি।'···

অমৃতা ওর হতচকিত ভাব কাটিয়ে উঠেই, সর্বাঙ্গের সমস্ত শক্তি দিয়ে অজয়কে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল, বলল, 'উঃ, অসহ্য, শয়তান, বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও এখনি।'···

অমৃতার স্বর এতই উচ্চগ্রামে উঠল, মধুসূদন কাছের দোকান থেকে ছুটে এলো। এসে দেখল, অজয় তখনো অমৃতার দিকে ঝুঁকে করযোড়ে কিছু বলবার জন্য কেবল গোঙানোর মতো শব্দ করছে। অমৃতা তেমনি বলে যাচ্ছে, 'বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও তুমি।'

মধুসূদন ব্যাপারটা কিছু না বুঝলেও, তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে স্টার্ট

দিয়েই গাড়ি চালিয়ে দিল। অমৃতা মুহূর্তেই মধুসূদনের কোলের ওপর এলিয়ে পড়ল। কেবল গলা দিয়ে একটা আহত কষ্টের শব্দ বেরোচ্ছে। অজয় বাঁদিকের দরজায় মাথা এলিয়ে যেন অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে।

গাড়ি কয়েক মিনিট চলার পরেই, অমৃতা হঠাৎ উঠে বসে, চিৎকার করে উঠল, 'থামাও, থামাও গাড়ি, হয় আমাকে নামতে দাও, নয়তো ওকে নামিয়ে দাও। মধু, ও আমার সারা গায়ে অসহ্য ব্যথা ধরিয়ে দিয়েছে, এই পশু আমাকে ভয়ংকর অপমান করেছে। আমি এক মুহূর্তও এখানে বসতে পারছি না।'

মধুসূদন গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিল। স্থানটি একটু নিরালা এবং অন্ধকার। অজয় কোন বাক্যব্যয় না করে, দরজা খুলেও, হঠাৎ অমৃতার পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে, আর্তকান্নার স্বরে ভেঙে পড়ল, 'আমাকে ক্ষমা কর অমি, আমি মহাপাপ করেছি। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, আমি পিশাচের মন্ত্রে আচ্ছন্ন হয়েছিলাম। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর। তোমরা ছাড়া আমার আর কেউ নেই। মধু, ক্ষমা কর ভাই ক্ষমা কর।'

দেখুন কী আশ্চর্য স্তব্ধতা পাটনা শহরের এক নিরালা অন্ধকারে। মধুসূদন দেখছে অমৃতাকে। অজয়ও যেন তড়িতাহত হয়ে, বাঁচবার শেষ মুহূর্তে নির্বাক যন্ত্রণায় স্থির হয়ে আছে। অমৃতার দু'হাতে মুখ ঢাকা। বলে উঠল, 'ক্ষমা করা সহজ, ক্ষমা করছি, যাও তুমি। কিন্তু আমি যে কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না, কিছুতেই না। আমার মাথার মধ্যে জ্বলে যাচ্ছে, জ্বলে যাচ্ছে! আমি পাগল হয়ে যাব।'
মধুসূদন উদ্বিগ্ন ব্যাকুলতায় অমৃতাকে জড়িয়ে ধরে, কাছে টেনে ডাকল 'অমি, অমি, একটু শান্ত হও।'

কিন্তু অমৃতা তখনো অস্ফুটে আর্তনাদ করছে, 'জ্বলে যাচ্ছে, জ্বলে

যাচ্ছে।' বলতে বলতেই ও চৈতন্য হারিয়ে ফেলল। মধুসূদন ওকে টেনে নিজের কোলের ওপর শুইয়ে দিল। অজয় দেখল, তারপরে কান্নার বেগে ভেঙে পড়ে বলল, 'কী করলাম, আমি কী সর্বনাশ করলাম? মধু, তুই অমিকে নিয়ে তাড়াতাড়ি একবার ডাক্তারের কাছে চল্। ওর জ্ঞান ফিরে আসার আগেই, আমি ওর সামনে থেকে চলে যাব।'

মধুসূদনের দু' চোখ জ্বলছিল, কেবল বলল, 'উপায় থাকলে, তোর ওই দুটো হাত আমি এখুনি মুচড়ে ভেঙে দিতাম।'

অজয় বলে উঠল, 'তাই দিস, মধু, তাই দিস, আমি নিজে তোর সামনে আমার দু' হাত বাড়িয়ে দেব। এখন তাড়াতাড়ি ওকে নিয়ে চল।'

মধুসূদন দ্রুত গাড়ি চালিয়ে দিল।

আপনাদের মনে আছে কি, অমৃতাকে কোথায় রেখে এতক্ষণের এই পরিক্রমা সারলেন? নীলাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে, অমৃতা হঠাৎই যেন অতি বেগে, অরণ্যের মাঝখানের পথে গাড়ি থামিয়ে ছুটে গিয়েছিল। ওর চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল একটা অসহ্য যন্ত্রণার অভিব্যক্তি। যেন ও কিছুতেই স্থির থাকতে পারছিল না, আর গাড়ির গতি ক্রমেই বাড়িয়ে যাচ্ছিল। তারপরে যেন অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে, গাড়ি হঠাৎ দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল রাস্তার এক পাশে। চারদিকে ঢেউ খেলানো লাল মাটি, লাল বন, আর ছোট ছোট টিলা। কোথাও একটা লোক দেখা যায় না। একটা বস্তিও নেই কাছে পিঠে।

চলুন, অমৃতার কাছেই আবার যাই। দেখুন, এখনো ও সেই ভাবেই

দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু মুখে চাপা দেওয়া হাত ওর বুকে নেমে আসছে। বিশেষ করে বাঁদিকের বুকে একটা অদ্ভুত ব্যথা, গভীরে যেন কুরে কুরে খায়। কোথায় চাপলে, হাত দিলে, আরাম হবে বুঝতে পারে না। এ সবই সেই, দরিয়াগঞ্জ থেকে ফেরবার পথের দুঃসহ স্মৃতির দংশন। ও জানে, ওর স্বামী মধুসূদন অজয়কে ক্ষমা করেছে বলেই, এখনো অজয় বাড়িতে এলে, মধুসূদন অমৃতাকে একবার বলতে আসে। কিন্তু অমৃতার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, ক্ষমা করা এক কথা, সমস্ত কিছুকে ঠিক মতো গ্রহণ করে, হৃদয়কে শান্ত করা আর এক কথা। কিন্তু সেই রাত্রের আকস্মিকতার জ্বালা, অমৃতা কখনো ভুলতে পারেনি।

অমৃতা জানে, মধুসূদনের কাছে অজয় কোন কথা গোপন করেনি। বরং এক সময়ে মধুসূদন বন্ধুর জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। অজয় যে কোন ঘটনা ঘটাতে পারত। অর্থাৎ নিজেকে বিকলাঙ্গ করা, অথবা আত্মহত্যা করা কোনটাই ওর পক্ষে তখন অসম্ভব ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অজয় যেন তাড়া খাওয়া পশুর মতো এই শহর ত্যাগ করে চলে গেছল। পাটনা হাইকোর্টে সে প্র্যাকটিস শুরু করেছিল। এখন তার সঙ্গে, নিজের পরিবারেরও কোন সম্পর্ক নেই। কেন, কী ঘটেছে, কেউ জানে না, তিনজন ছাড়া। অজয়ের বাড়ির লোকেরা উৎকণ্ঠায় অস্থির। ওর অভূতপূর্ব পরিবর্তনের ধাকা, ওর বাবা সামলাতে পারেন নি। মারা গেছেন। বাড়ির বড় ছেলে পাটনায় চলে যাবার পরে, স্বভাবতই অজয়দের পারিবারিক চেহারা-টাই যেন বদলে গেছে।

কিন্তু অজয় একেবারে এই জেলা শহর ত্যাগ করেনি। কখনো কখনো হঠাৎ আসে। জেলাকোর্টের কেস থাকে, অথবা মায়ের বা দাদাদের কারোর শরীর খারাপ, কিংবা বাড়িতে কোন কাজের উপলক্ষেও আসে। এলেই সে একবার মধুসূদনের কাছে আসে।

অমৃতা জানে, শুধু বাড়িতেই না, অজয় অন্যত্রও মধুসূদনের সঙ্গে দেখা করে। মধুসূদন সে সব কথা অমৃতাকে নানা ভাবে বলতে চায়। অমৃতা নির্বিকার ভাবে চলে যায়। কোন কথাই শুনতে চায় না। তবু যতটুকু শুনেছে, জেনেছে, অজয় এখন পাটনা হাইকোর্টের একজন নাম করা উকীল, কিন্তু পাটনায় সবাই তাকে অস্থির মস্তিষ্ক মাতাল বলে জানে। সে নাকি আজকাল ঘোরতর মদ্যপ হয়েছে।

অমৃতার কিছুই যায় আসে না। অজয় একজন পাকা মদ্যপ হবে, এটা যেন ওর জানাই ছিল। কিন্তু সে সুনন্দাকে বিয়ে করেনি। সুনন্দার বিয়ে হয়ে গেছে। অজয় এখনো পর্যন্ত অবিবাহিত। এবং কেউ তাকে বিয়ের কথা বলতে নাকি সাহস পায় না।

কিন্তু এটা কিসের ব্যথা? অমৃতা বুকে হাত রেখে, মনে মনে যেন তীক্ষ্ণ কষ্টের যন্ত্রণায় জিজ্ঞেস করল। বুকের যন্ত্রণা ওকে এই মুহূর্তে পুরনো স্মৃতি ভুলিয়ে দিচ্ছে ক্রমেই যেন সমস্ত মস্তিষ্ক জুড়ে, বুকের ব্যথাটাই ছড়িয়ে যাচ্ছে। এমনও অনেকদিন হয়েছে, মধুসূদনের ব্যাকুল সোহাগের সময় এই ব্যথা ওর তীব্র হয়ে উঠেছে। উঠলেও, বলতে পারেনি। কারণ ও শুনেছে নারী গর্ভিনী হলে, তাঁর বক্ষস্থলে ব্যথা হতে পারে। যেমন প্রতিটি ঋতুর সময়ে কিঞ্চিৎ ব্যথা অনুভূত হয়।

অমৃতা স্মৃতির যে উত্তেজনা ও যন্ত্রণায় ভুগছিল, যে কারণে অনেকটা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বিবেচনাহীন বেগে গাড়ি চালিয়ে ছুটে এসে-ছিল, সেটা এখন অনেকখানি প্রশমিত। কিন্তু বুকে এই ব্যথাটা কিসের? মনে হয় যেন স্তনের গভীরে তীক্ষ্ণ ছুঁচ দিয়ে খোঁচাখুঁচি চলছে। ও গিয়ে গাড়িতে বসল, স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে, গাড়ি স্টার্ট করার আগে ভাবল, অজয় কেন আসে এখনো ওদের বাড়িতে। অজয় যেদিন আসে, সেদিনই কি বুকের ব্যাথাটা বড় বেশি করে অনুভূত হয়?

অমৃতা গাড়ি স্টার্ট করে ঘুরিয়ে নিল।

জেলা কোর্টের বার রুম। বিকেল পাঁচটা। বাররুম প্রায় ফাঁকা। মধুসূদন আর অজয় মুখোমুখি বসে। দেখেই বুঝতে পারছেন, দুজনের মধ্যে কথাবার্তা আগে থেকেই চলছে।

মধু: 'কিন্তু অজয়, সব অর্থহীনতার একটা সীমা আছে।'

অজয় ওর পকেট থেকে একটি হুইস্কির নিম্‌ফ্‌ সাইজ বোতল বের করে কাঁচাই চুমুক দিল, হেসে বলল, 'মধু, তোর কথা আমি বুঝি। কিন্তু আমার কাছে জীবনের সবই অর্থহীন হয়ে গেছে।।'

মধু: 'এটা এক ধরনের উন্মত্ততা ছাড়া আর কিছু নয়।'

অজয়: 'তাও বোধহয় ঠিক। কিন্তু বলতে পারিস মধু, এ বিশ্ব সংসারের কোনটা অর্থময়? ব্যক্তির নিজের জীবনের প্রয়োজন, অথবা সমষ্টির প্রয়োজনেই সবাই সব কিছুকে অর্থময় দেখছে। আমি দেখছি না।'

মধু: 'তবে এই সব মামলা মোকদ্দমারই বা কী দরকার? ছেড়ে দিলেই তো পারিস।'

অজয়: 'দিতে চাই। তারপরে আর বেঁচে থাকার কোন প্রয়োজন থাকবে না। এখনো নেই। তবু কেন যে আত্মহত্যা করতে পারছি না, নিজেই জানি না।'

মধু: 'এক থাপ্পড় মারব।'

অজয় গাল বাড়িয়ে দিয়ে, মধুসূদনের একটা হাত টেনে ধরে বলল, 'মার, মধু। এতদিন বলেই এলি, একদিনও মারলি না তো? তুই যদি একটু মারতিস, তা হলে শান্তি পেতাম।'

মধুসূদন হাত ছাড়িয়ে নিল। অজয় নিম্ফ্ উঁচু করে গলায় ঢালল, বলল, 'মধু আমি এখন ভাগ্য মানি। অভিশাপ মানি। যুক্তি দিয়ে তুই আমাকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করিস না। যুক্তির আর এক নাম ফাঁকি। ওতে শুধু অংক মেলানো যায়, জীবন মেলানো যায় না। নইলে বলতে পারিস, আমি কেন জন্মলগ্ন থেকেই এমন অভিশপ্ত হয়ে জন্মেছিলাম।'

মধু: 'বাজে কথা। জন্মলগ্ন থেকে কেউ অভিশপ্ত হয়ে জন্মায় না।' অজয় হেসে বলল, 'জন্মলগ্নেই তা বোঝা যায় না। বোঝা যায় পরে। যেমন আমার বোঝা যাচ্ছে।'

মধু: 'এ সবই তোর নিজের তৈরি।'

অজয়: 'নিজের তৈরি?'

মধু: নিশ্চয়ই। কী হয়েছে তোর? আমরা যাকে স্বাভাবিক জীবন যাপন বলি, সেই জীবন যাপন করতে তোর বাধা কোথায়?'

অজয়: 'বাধা সেখানেই, যেখানে আমি নিজেকে সাধারণ জীবন-যাপনের পর্যায়ে ফেলতে পারছি না। তুই দয়া করে আমাকে তীর্থদার ফিলজফি বোঝাবার চেষ্টা করিস না। তাহলে তো জগত জুড়ে, তীর্থদাদের জগতটাও তাঁদের মনোমত স্বর্গ হয়ে উঠত। হল না তো! হয় না, হয় না। মানুষ তার নিজের পরাধীনতার মধ্যে আবদ্ধ। সেখান থেকে কেউ তাকে স্বাধীন করতে পারে না।' অজয়ের কথা শেষ হবার আগেই, ওর ওপরের দাদা সুজয় মজুমদার বার রুমে ঢুকলেন, বললেন, 'বাড়ি যাবার পথে তোর গাড়িটা দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বাড়ি যাবি তো?'

অজয় যেন চমকে হাতের ঘড়ি দেখল। তাড়াতাড়ি নিম্ফ বোতলটা

কোটের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে, লাফিয়ে উঠে বলল, 'সাড়ে পাঁচটা! অসম্ভব, আমি এক্ষুণি পাটনায় ফিরে যাব।'

মধুসূদনও দাঁড়িয়ে বলল, 'তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে অজয়? এখন পাঁচ ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে যাবি? ড্রাইভার তো সঙ্গে আনিসনি।'

অজয় বলল, 'না, আমি তো কোন সময়েই ড্রাইভার আনি না। আমার ক্লার্ক সঙ্গে আছে।' বলে মধুর কাঁধে হাত রেখে চাপ দিয়ে বলল, 'চলি রে।' সুজয়ের দিকে ফিরে বলল, 'দাদা, বাড়ি যাবার আর সময় হবে না। মাকে একটু বুঝিয়ে বলে দিও।' বলেই ছুটে বাইরে গেল।

মধুসূদন তাকাল সুজয়দার দিকে। সুজয়দা বললেন, 'কী যে ওর হল, আজ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম না।'

মধুসূদন সে-কথার কোন জবাব না দিয়ে বাইরে এলো। দেখল অজয় ওর গাড়িতে চালকের আসনে বসে, গাড়ি স্টার্ট দিয়েছে। পিছনের আসনে বসে আছে ওর মুহুরি ক্লার্ক। অজয় হাত নেড়ে, মধুসূদনকে বিদায় জানিয়ে, তুরন্ত বাঁক নিয়ে, দ্রুত রাস্তায় গিয়ে পড়ল। মনে মনে বলল, 'ভাই মধু, মাফ করিস্।'

তারপরেই ওর মনে প্রশ্ন জাগল, এখনো ও কেন মধুসূদনের বাড়ি যায়? জবাবটা ওর কাছে অস্পষ্ট নয়। ও অমৃতাকে দেখতে চায়। তার মধ্যে কোন কাম মোহ কিছু নেই। জীবনে একটি আকাঙ্ক্ষা, বড় আশা, অমৃতা আবার তার সামনে এসে কেবল, আগের মতো হেসে একবারটি কথা বলে যাবে। বলে যাবে, 'কেমন আছ অজয়? আমি শুধু তোমাকে ক্ষমা করিনি, সে সব আমি ভুলে গেছি, ভুলে গেছি।'...ভাবতে ভাবতেই স্টিয়ারিং থেকে বাঁ হাতটা তুলে, যেন এক খণ্ড মাংসের মতো কামড়ে ধরল।

পিছনে বসা ক্লার্ক অস্ফুটে ডেকে উঠল, 'স্যার!'

কিন্তু দেখুন, অজয়ের বাঁ হাতের উল্‌টো দিকে দাঁত বসে গেছে, রক্তের ধারা চুঁইয়ে পড়ছে। এ হাত দিয়েই ও অমৃতার নিষ্পাপ বুকে প্রথম কঠিন স্পর্শে আকর্ষণ করেছিল। লক্ষ্য করে দেখুন, বাঁ হাতের পিছনে অনেক ক্ষতের দাগ। কথাটা মনে হলেই, ও যেন খ্যাপা বাঘের মতো, নিজের বাঁ হাতের ওপর তীক্ষ্ণ দাঁতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হাতে কামড় বসিয়েও ও মনে মনে বলছে, 'আর কিছু চাই না আমি। আর কোনদিন না। একদিন, একবার তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে, শুধু এই কথা কয়টি বলে যাও।' ··

অজয়ের মনের এ কথাটা একমাত্র মধুসূদনই জানে। অনুভব করে। সেইজন্যই ও অজয় এলেই অমৃতাকে ডাকতে যায়। মধুসূদন জানে, অজয়ের মুক্তি একমাত্র সেখানেই। রোগ মুক্তি, ওর জীবনের সকল ব্যাধির আরোগ্য।

কিন্তু তাই যদি ঘটবে, তাহলে এই অনিত্য সংসারকে মায়াময় বলা হবে কেন?

যা দেখলেন তার সাত দিন পরেই, দেখুন, সন্ধ্যাকালে, অমৃতার ঘরে, ওকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে আছে মধুসূদন। ওর চোখে উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা। অমৃতার মুখে যন্ত্রণার ছাপ। ডান হাত ওর বাঁ বুকে। বলল, 'না না, আমি কোন ডাক্তারের কাছে যেতে পারব না মধু। আমার লজ্জা করবে।'

মধুসূদন বলল, 'অসুখের জন্য আবার লজ্জা কিসের অমি? এর আগেও তুমি দু-একদিন বলেছ, আমি তেমন বুঝতে পারিনি। কিন্তু ব্যথাটা কিসের জন্য হচ্ছে, একবার না দেখালে জানা যাবে কী করে?'

অমৃতা বলল, 'বেশ, তাহলে তুমি আমাকে ডঃ মিসেস ব্যানার্জির কাছে নিয়ে চল, তিনিই আমাকে দেখে দেবেন।'

মধুসূদন বলল, 'কিন্তু উনি তো গায়নোকলজিস্ট, ফিজিশিয়ান তো নন। ডঃ মৈত্রকে দেখাতে তোমার আপত্তি কিসের? বিশেষ করে ব্যাথাটা যখন কন্টিনিউ করছে। তা ছাড়া ডঃ মৈত্র যথেষ্ট রসিক লোক, আমাদের পিতৃতুল্য।'

অমৃতা মধুসূদনের বুকের কাছে মাথা রেখে বলল, 'প্লিজ, আগে ডঃ মিসেস ব্যানার্জীর কাছে চল। উনি যদি বলেন, তখন না হয় ডঃ মৈত্রর কাছে যাওয়া যাবে।'

মধুসূদন রাজী হল। কারণ অমৃতা যখন আগে ডঃ মিসেস ব্যানার্জিকে দেখাতে চাইছে, তার মধ্যে কোন কারণ থাকতে পারে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দুজনে প্রস্তুত হয়ে, বেরোবার আগে অমৃতা শাশুড়িকে বলল, 'মা, শরীরটা ভালো নেই, ওর সঙ্গে একবার ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি।'

মধুসূদনের মায়ের ব্যথা ও হতাশা একটিই। অমৃতার আজ পর্যন্ত কোন সন্তান হয়নি। ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কথা শুনেই, তিনি যেন প্রত্যাশিত চোখে পুত্রবধূর আপাদমস্তক দেখলেন, বললেন, 'যাও মা, দেখিয়ে এসো। ভগবান তোমাকে সুস্থ রাখুন, ভালো করুন।'

অমৃতা জানে, শাশুড়ি তাঁর আশীর্বাদের মধ্যে কী আশা ব্যক্ত করতে চাইছেন। ও মনে মনে করুণ হেসে, গাড়িবারান্দায় অপেক্ষারত, মধুসূদনের পাশে গাড়িতে গিয়ে বসল। ডঃ মিসেস ব্যানার্জির চেম্বার প্রায় চক এলাকার কাছেই। সেখানে তিনি একটি ছোট-খাটো নার্সিং হোমও চালান। অল্পক্ষণের মধ্যেই মধুসূদন অমৃতাকে

নিয়ে তাঁর চেম্বারে পৌঁছলো। ভিড় খুব বেশি ছিল না। মধুসূদন একটি স্লিপ রেখে, এ্যাটেনডেন্টের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিল।

শহরের অবস্থাপন্ন বাঙালী অবাঙালী, সকলেই, বিশেষ করে মহিলাদের রোগের বিষয়ে ডঃ মিসেস ব্যানার্জির কাছেই আসেন। তাঁর যথেষ্ট সুনামও আছে। কয়েক মিনিট পরেই, তিনি চেম্বারের বাইরে এসে, মধুসূদনকে নমস্কার করে অমৃতাকে হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন সুসংবাদ আশা করতে পারি কী?'

মধুসূদন তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ডঃ ব্যানার্জি, ব্যাপারটা অন্য রকম। আপনার সময় হলে, অমিকে একটু ভালো করে দেখুন।'

ডঃ মিসেস ব্যানার্জি, দোহারা চেহারা, চোখে চশমা, অমায়িক আর হাসি খুশি। রুগীদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে বললেন, 'আর তো মাত্র কয়েকজন। আমি এখুনি মিসেস মিত্রকে ডাকছি।' বলে তিনি আবার ভিতরে চলে গেলেন। মাত্র কয়েকজন হলেও, প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগল। তারপরে অমৃতার ডাক পড়ল। মধুসূদন বাইরে বসে রইল। পাঁচ মিনিট পরেই, ভিতর থেকে বেড়িয়ে এলেন ডঃ মিসেস ব্যানার্জি। মধুসূদনের কাছে এসে দাঁড়াতেই, সেও উঠে দাঁড়াল। ডঃ ব্যানার্জির মুখের হাসি কিঞ্চিৎ ম্লান, বললেন, 'মিঃ মিত্র, মিসেস মিত্রের লেফ্ট ব্রেস্ট দেখে, আমার সন্দেহ হচ্ছে, ভেতরে কোন এ্যাবসেস্ গ্রো করে থাকতে পারে। ভয়ের কিছু নেই। একে আমাদের চলতি বাংলায় 'ঠুন্কো' বলে। মেয়েদের বুকে অনেক সময় ঠুন্কো হয়। তবে, জেনারেলি সন্তানের মাথার আঘাতে বা অন্য কান রকম আচমকা আঘাতেই এ-রকম ঘটতে পারে।'

মধুসূদন জিজ্ঞেস করল, 'আঘাতের কত দিনের মধ্যে এ রকম ঘটতে পারে?'

ডঃ মিসেস ব্যানার্জি বললেন, 'তখন তখনই। রুগীর টের পেতে দু-তিন দিন সময় লাগতে পারে। ব্যথাটা চেপে গেলে, ভোগান্তির মাত্রাটা বেশি হতে পারে। অবশ্য এজন্য স্বামীদেরও আমরা দায়ী করি। যাই হোক, মিসেস মিত্র বললেন, কিছুকাল থেকেই নাকি ব্যথাটা ফিল্ করছেন। আমি বলছি, ওঁকে একবার অন্য কারোকে দেখান।'

'কাকে দেখাব ?'

'ডঃ মৈত্রকেই দেখান না। আমি যা বলেছি, তাও ডঃ মৈত্রকে বলতে পারেন।'

মধুসূদনের মনে অস্বস্তি বাড়ল। বলল, 'ঠিক আছে। আপনি ওকে ডেকে দিন, তাহলে এখনই একবার ডঃ মৈত্রর কাছে ঘুরে যাই। রাত্রি তো বিশেষ হয়নি।' বলে পকেট থেকে পার্স বের করে, টাকা তুলে ডঃ ব্যানার্জিকে এগিয়ে দিল।

ডঃ ব্যানার্জি টাকা নিয়ে, ভিতরের দরজা-ফাঁক করে ডাকলেন, 'আসুন মিসেস মিত্র।'

অমৃতা বেরিয়ে এলো। মধুসূদন অমৃতাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে মিসেস ব্যানার্জির কথা বলল। অমৃতা অবাক হয়ে বলল, 'ঠুন্‌কো ? সে আবার কী রোগ ? বউদির মুখে কখনো শুনিনি তো ?'

মধুসূদন শুকনো হেসে কলল, 'সকলের অভিজ্ঞতা তো এক নয়। চল

তাহলে একবার ডঃ মৈত্রকে দেখিয়েই যাই।'

অমৃতা কিছুটা হতাশা ও অনিচ্ছার সঙ্গে বলল, 'অগত্যা।'

মধুসূদন অমৃতাকে নিয়ে গাড়িতে উঠে, ডঃ মৈত্রর চেম্বারে এলো। চক থেকে আধ মাইলের মধ্যেই তাঁর দোতলা বাড়ি। একতলায় চেম্বার। তাঁর ঘরে তখন রুগীর থেকে, তাঁর বয়স্ক বন্ধুদের ভিড়ই বেশি। মধুসূদনকে দেখেই, টাক পড়া প্রায় প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় পৌঁছুনো, ডঃ মৈত্র ডেকে বললেন, 'মধু যে! একেবারে বউমাকে নিয়ে? কী ব্যাপার?'

মধুসূদন হেসে, কিন্তু আড়ষ্ট ভাবে সকলের দিকে একবার দেখে নিয়ে বলল, 'আপনার কাছেই এসেছি মৈত্রকাকা। অমির জন্য এসেছি—ওকে একটু—।'

ডঃ মৈত্র চেয়ার ছেড়ে উঠে, পাশের ঘরে যেতে যেতে বললেন, 'নিশ্চয়। এসো এসো, দেখি বউমার আবার কী হল। তুমিও এসো মধু।'

মধুসূদন অমৃতাকে নিয়ে দরজার পর্দা সরিয়ে পাশের ঘরে ঢুকল। সেখানেও বসবার চেয়ার ছিল। ডঃ মৈত্র অমৃতাকে বললেন, 'বস বউমা। হ্যাঁ, কী ব্যাপার মধু?'

মধুসূদন একবার অমৃতাকে দেখে, ইংরেজিতে সব কথা বলল। ডঃ মিসেস ব্যানার্জির কথাও বলতে ভুলল না। ডঃ মৈত্র সব শুনে, অমৃতাকে ডেকে, রুগীর খাট দেখিয়ে বললেন, 'এসো তো মা, এখানে একটু শোও, আমি দেখি।...না না, তোমার লজ্জার কিছু নেই মা, আমি তোমার পিতৃতুল্য তোমার সমান আমার মেয়েরা রয়েছে। তোমাকে জামা-টামা কিছু খুলতে হবে না। তুমি শুয়ে পড়।' বলে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'মধু, তুমি এখানেই থাক।'

অমৃতা বিছানায় শুয়ে পড়ল। ডঃ মৈত্র প্রথমে স্টেথিস্কোপ দিয়ে

অমৃতার বুক দেখলেন। তারপর স্টেথিস্কোপ রেখে, বিশেষ করে বাঁ বুকে, আলতো স্পর্শ করে, জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, কোথায় কী রকম ব্যথা। অমৃতা যতটা লজ্জা পাবে ভেবেছিল, এখন দেখা গেল, ডঃ মৈত্রর সামনে, সে-রকম গুটিয়ে যাচ্ছে না। দুই বুক, কণ্ঠা, গলা, সব কিছু দেখতে দেখতে ডঃ মৈত্র অমৃতার মাথায় হাত দিলেন। চুলে আলতো টান দিতেই কয়েকটা চুল হাতে উঠে এলো। জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁ বউমা, তোমার মাথার চুল কি এ রকমই উঠে যায়?'

অমৃতা বলল, 'না, ইদানিং কিছুকাল দেখছি, মাথার চুল উঠতে আরম্ভ করেছে।'

ডঃ মৈত্র গম্ভীর মুখে আওয়াজ করলেন, 'হু। উঠে বস, আমার দেখা হয়ে গেছে। কিছুকালের মধ্যে ওজন-টোজন দেখেছিলে নাকি?'

অমৃতা অবাক চোখে একবার মধুসূদনকে দেখে বলল, 'না তো।'

'কতদিন আগে ওজন নিয়েছ?'

'মনে করতে পারছি না।'

'তবু? ধর বছর খানেক আগে?'

'তা হবে।'

'তখন কত ওজন ছিল মনে আছে?'

'ষাট কে. জি.।'

'তাহলে নেমে এসে ওজনের যন্ত্রটায় দাঁড়াও তো, দেখি এখন ওজন কত আছে ?'

অমৃতা খাট থেকে এলো। ঘরের এক পাশে একটি ওজনের যন্ত্র ছিল। সেখানে গিয়ে ও দাঁড়াল। ডঃ মৈত্র সামনে গিয়ে দেখে বললেন, 'নেট আটান্ন কে.জি.। দু কে.জি. কমেছে। নেমে এসো। কোন দুর্বলতা টের পাও ?'

অমৃতা বলল, 'সে-রকম কিছু পাইনি।'

'আচ্ছা, তুমি গিয়ে বাইরের ঘরে বস, আমি মধুর সঙ্গে কথা বলে আসছি।'

অমৃতা মধুসূদনকে একবার দেখে, শাড়ি বিন্যস্ত করে বাইরে বেরিয়ে গেল। মধুসূদনের মনে উৎকণ্ঠিত কৌতূহল। জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার মৈত্রকাকা ?'

ডঃ মৈত্র মধুসূদনের সামনে এসে, নীচু গম্ভীর স্বরে বললেন, 'মধু তোমার কাছে গোপন করার কোন মানে হয় না। আমার মনে হয়, বউমার লেফ্‌ট ব্রেস্টের বায়প্‌সি করা দরকার। সেটা আর দেরি করলে হবে না যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, বায়প্‌সি করে রিপোর্টটা দেখা দরকার।'

মধুসূদনের মুখ দিয়ে যেন স্খলিত স্বরে উচ্চারিত হল 'বায়প্‌সি ? মানে—'

ডঃ মৈত্র বললেন, 'কোন মানে-টানে নয় মধু। পারলে দু-একদিনের মধ্যেই বউমাকে নিয়ে কলকাতায় যাও। কলকাতাই বেস্ট জায়গা।

ওখানে কয়েকদিন থাকতে অসুবিধে হবে? তোমাদের আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই?'

মধুসূদন বলল, 'আত্মীয়স্বজন আছেন, তবে তাঁদের ডিস্টার্ব করতে চাই না।'

বেশ, তাহলে আমি আমার পরিচিত এক ডাক্তারকে চিঠি লিখে দিচ্ছি। তুমি হোটেলে থাকতে পারো, বউমা হসপিটালে বেড পেয়ে যাবে।'

'কোন্ হস্পিটালে?'

'ক্যান্সার হস্পিটালে। অবশ্য সবই নির্ভর করছে, বায়প্সি রিপোর্টের ওপর।'

আপনারা জীবন ও জগতকে বিচিত্র বলেছেন। আখ্যা দিয়েছেন আরও নানা কিছু বলে। কিন্তু সব কিছুর কারণ ব্যাখ্যা সম্ভব হয়নি। যেমন সম্ভব হয়নি, পাণ্ডুর প্রতি কিমন্দস্ মুনির অভিশাপের ফল, কেন তিনি স্ত্রী-সঙ্গমে রত হলেই মৃত্যুমুখে পতিত হবেন, বা হয়েছিলেন। বাস্তবে যা-ই ঘটে থাকুক, মাদ্রীর সঙ্গে সহবাস করতে গিয়েই, মহামতি পাণ্ডু মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সেই ব্যাধির কারণ নির্ণয় করা যায়নি।

মানুষের কর্কট রোগের কারণও নির্ণয় করা আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। অথচ তার জন্য, মানুষকে পাণ্ডু রাজার মতো কোন অভিশাপগ্রস্ত হতে হয় না। যাদের জীবনের কাছে আপনাদের নিয়ে এসেছি, তাদের মধ্যে কারো যদি অভিশাপগ্রস্ত হওয়া উচিত, সে অজয় মজুমদার। কিন্তু অমৃতা?

আসুন, কলকাতা ক্যান্সার হাসপাতালের এক কেবিনে। দেখুন, অমৃতা অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। মধুসূদনের দুই চোখে জলের

ধারাও গলেনি। কারণ, সে কাঁদতেও পারছে না। ডঃ মৈত্রর কথানুযায়ী সে তার মামলা-মোকদ্দমার সব ব্যবস্থা করে, অমৃতাকে নিয়ে কলকাতায় এসেছিল। ডঃ মৈত্র চিঠি দিয়েছিলেন, বিশেষ অভিজ্ঞ ডঃ জি. পোদ্দারকে। অমৃতাকে দেখেই তিনিও ডঃ মৈত্রের কথার প্রতিধ্বনি করে, বরং একটু বেশি ব্যস্ততার সঙ্গে বলেছিলেন, 'বায়প্সি আরো আগে করালেই ভালো হত।'

মধুসূদন অবশ্য কলকাতায় আসবার আগে, অমৃতাকে সব কথা না বলে পারেনি। অমৃতা খুব সাধারণ বুদ্ধির মেয়ে নয়। ও বুঝেছিল, ওর ব্যাধির স্বরূপটা কিঞ্চিৎ অসাধারণ। কথাটা কি ওর নিজেরও কখনো কখনো মনে হয়নি? দূর মেঘে বিদ্যুৎ চমকের মতো, মনটা চমকে চমকে ওঠেনি? ও বলেছিল, 'মধু, বৃথাই তুমি আমার কাছে গোপন করছ। সম্ভবত আমার বুকে এ্যাবসেসের থেকেও বেশি কিছু হয়েছে, যা শুধু অপারেশনেই শেষ হবে না।'

মধুসূদন বলেছিল, 'অমি, আমি আশাবাদী। কারণ, আমি তুমি, কেউ কোন অন্যায় তো করিনি। কারো কোন ক্ষতি তো করিনি?'

অমৃতা হেসে বলেছিল, 'বিশ্বসংসারে যারা অসুখে ভুগে মরে, তারা সবাই কি অন্যায় করেছে?'

মধুসূদন জবাব দিতে পারেনি। ডঃ মৈত্রর চিঠি পেয়ে, ডঃ পোদ্দার মধুসূদনের সঙ্গে খুবই ভালো ব্যবহার করেছেন। অমৃতাকে পরীক্ষা করেই, তিনি ওর ওয়ার্ডের ব্যবস্থা করেছেন। মধুসূদন মধ্য কলকাতার একটি হোটেলে আশ্রয় নিয়েছিল। মাত্র পাঁচদিন আগে ওরা এসে পৌঁছেছে। পরের দিনই অমৃতার বায়প্সি হয়, এবং সেই রিপোর্ট ডঃ মৈত্রর সন্দেহকে বাস্তবে প্রমাণিত করেছিল। শুধু তাই নয়, ডঃ পোদ্দার বলেছিলেন, ব্যাধির বিস্তার এতই দূরপ্রসারী, এখনই ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

কী ব্যবস্থা? মধুসূদন কম্পিত স্বরে জানতে চেয়েছিল। 'অপারেশন?'

ডঃ পোদ্দার ম্লান হেসে বলেছিলেন, 'না মিঃ মিত্র। অপারেশন ঠিকই, তবে এটা এ্যামপিউট। আপনার স্ত্রীর বাঁ বুকটি অচিরাৎ শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। এটা নিরাময়ের কথা নয়, রোগ দমনের একটা পদ্ধতিমাত্র, আর তা করতে হবে এখনই। আপনারা স্বামী স্ত্রী প্রস্তুত থাকলে, আমি তা করব।'

এর পরের দৃশ্যটি খুবই ছোট। মধুসূদন আর অমৃতা মুখোমুখি। জানাজানি হয়ে গেছে আগেই, কী ঘটতে চলেছে। অমৃতার অন্তরে যথেষ্ট শক্তি। তবু নারীর বক্ষ, সে যে তার এক বড় পরিচয়। জীবনের থেকে তার মূল্য কোন অংশে কম না। আপাতদৃষ্টিতে বেঁচে থাকার জন্য, তার মূল্য যত কানাকড়িই হোক। ও হঠাৎ মধুসূদনের বুকে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলেছিল, 'মধু, আমার জীবনে কেন এই অভিশাপ?'

অথচ অমৃতা নিজেই ব্যাধির বিষয়ে অভিশাপের কথা অগ্রাহ্য করতে চেয়েছিল। মধুসূদন কোন জবাব দিতে পারেনি। অমৃতা বলেছিল, 'আমি জানি, আমি জানি মধু। আমার এ বুকে পাপের থাবা পড়েছিল। মহাপাপের স্পর্শে আমার এই অঙ্গ হারাতে হচ্ছে। যাক, আমি জানব পাপের গ্রাস থেকে মুক্ত হলাম।'

মধুসূদনের মনে হয়েছিল, ওর বুক ফেটে গলা ফেটে একটা চিৎকার বেজে উঠবে, চোখ ভেসে যাবে। কিন্তু কোনটাই ঘটেনি। জীবনের সবই যেন অতি আকস্মিক কতগুলি দৈব দুর্ঘটনা মাত্র। দুর্ঘটনা যদি না-ও বলা যায়, ক্ষেত্রবিশেষে তা শুধু দৈব ঘটনার সমষ্টি মাত্র। এখন ও দেখছে, কেবিনে শোয়ানো অচৈতন্য অমৃতাকে। আজই ওর বাম বক্ষ শরীর থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। যে অমৃতাকে দেখে

আপনারা একদা মুগ্ধ হয়েছিলেন, তার অর্দ্ধেকই গত। আর দেহের ক্ষেত্রে অর্দ্ধেক মানেই, অনেকখানি।

মধুসূদনের আত্মীয়স্বজনরা ওকে একেবারে পরিত্যাগ করেনি। কারণ ওর মা কলকাতায় এসেছেন। তিনি কোন হোটেলে ওঠেননি। মধুসূদনও আপাতত হোটেল ছেড়ে আত্মীয় বাড়িতে অবস্থান করছে। অমৃতাকে হাসপাতাল থেকে ছাড়াতে এক মাসের ওপর সময় লাগল। এখনো কিছুদিন থাকতে হবে।

আপনাদের যুক্তি ও কার্যকারণের ব্যাখ্যা শোনবার সদিচ্ছা আমার নেই। আমি পতঙ্গ মাত্র, জীবনকে দেখেছি, এ বেলার হাসি ও বেলার চোখের জলের মতো। কোনটাই স্থায়ী নয়। হাসির মতো চোখের জলও মিলিয়ে যায়, শুকিয়ে যায়। আমার সঙ্গে আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন, বক্ষ বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে, অমৃতার পরমায়ু যতটা নিষ্প্রভ হয়ে এসেছিল, যেন আর বেশিক্ষণের মেয়াদ এই পৃথিবীতে ওর নেই, তা নয়। ও বেঁচে উঠল। কিন্তু সে অমৃতা নয়। এই এক মাসের মধ্যে আপনারাও প্রতিদিন দেখলেন, ওর মুখের চেহারা কী আশ্চর্য বিবর্ণতা ছায়া ফেলেছে। বালিশে জড়িয়ে থাকে উঠে যাওয়া চুল। গায়ের সেই উজ্জ্বল রঙের প্রভায় যেন সন্ধ্যান্ধকারের কালিমা। চোখের কোলে যেন গভীর পরিখা।

মধুসূদনকেও দেখছেন। আপনারা যাকে গৃহিনী সচিব-সখী বলেছেন অমৃতা ওর জীবনে ঠিক তাই। একটা মাস ও চুল দাড়ি কামাতে ভুলে যাবে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। চুল কাটতে কোথাও ঢোকবার কথা মনেও আসেনি। কলকাতায় কে-ই বা এখন আর ওর জামা-কাপড়ের বাছ-বিচার করছে? কে দেখাশোনা করছে? ইতিমধ্যেই ওকে অনেকটা শীর্ণ দেখাচ্ছে। মাথার কালো ঢেউ খেলানো চুলগুলিতে হঠাৎ কে কয়েকটা রুপোলি রেখা এর মধ্যেই এঁকে দিল? কিছুই বোঝবার উপায় নেই। জীবনের যুক্তি আর

ব্যাখ্যাগুলি যেন, নিশ্চিত তীরের মতো হাতে থেকেও নিষ্ফল ভাবে হারিয়ে যাচ্ছে।

মধুসূদন অমৃতার সামনে এসে দাঁড়ালে, এখন অমৃতাই হাসে। ম্লান হেসে বলে, 'তুমি গোঁফ দাড়ি কামাওনি কেন?'

'কামাবার সময় অনেক পাব অমি।'

'আমি মরে গেলে?'

'অমি।'

অমৃতা হেসে বলে, 'ঠাট্টা করে বলেছি। আমি এত সহজে মরব না।'
'কিন্তু নিজের দিকে একবার তাকিয়ে দেখেছ?'

মধুসূদনের জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে, 'তুমি কি তোমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখেছ?' ওর ইচ্ছা করে, একটা আয়না ওর চোখের'সামনে তুলে ধরে। তারপরেই বুকের মধ্যে কেঁপে ওঠে।

ডঃ পোদ্দার যখন অমৃতাকে ছাড়তে চাইলেন, মধুসূদন বলল, 'আপনি এমন দিনে ওকে ছাড়ুন, যেদিন ওকে নিয়ে আমি আমাদের বাড়ি ফিরে যেতে পারি।'

ডঃ পোদ্দার বললেন, 'এখন যে কোন দিনই নিয়ে যেতে পারেন। ওষুধপত্র নিয়মিত চালিয়ে যাবেন।'

মধুসূদন জিজ্ঞেস করল, 'ডঃ পোদ্দার, কী রকম বুঝছেন?'

ডঃ পোদ্দার মধুসূদনের কাঁধে হাত রেখে সস্নেহে বললেন, 'আপনারা ইয়ং ছেলে, বুদ্ধিমান। গোপন করার কিছু নেই। এ ব্যাধি সম্পর্কে কিছুই বলা যায় না। সী মে সারভাইভ কর লাইক লং। আবার

হঠাৎ কিছু ঘটেও যেতে পারে। তবে ওকে দীর্ঘকাল শুয়ে থাকতে হবে। আগের মতো জীবন আর ফিরে পাবে না।'

মধুসূদন ডঃ পোদ্দারের হাত ধরে বলল, 'আপনাকে খবর দিলেই, নিয়ে যেতে পারব তো ?'

ডঃ পোদ্দার বললেন, 'নিশ্চয়ই, আমাকে ওর অবস্থা জানাবেন।' অমৃতা কলকাতা থেকে যাবার আগে বলল, 'আমাকে পাটনায় নিয়ে চল।' তারপর আবার কী ভেবে বলল, 'না থাক, তোমাকে ছেড়ে কোথাও থাকব না। বাড়িতেই নিয়ে চল।'

কিন্তু মধুসূদনের মা বললেন, তিনি আর বাড়ি ফিরে যেতে চান না। মধুসূদনের ঠাকুরদার একটি বাড়ি আছে বেনারসে। তিনি মধুসূদনকে বললেন, তাঁকে সেখানেই পাঠিয়ে দিতে। এই সঙ্গে আরো একটি ঘটনা ঘটল। মধুসূদনের দিদি তাঁর কন্যা লীনাকেও আর মধুসূদনের কাছে রাখতে চাইলেন না অতএব মধুসূদন অমৃতাকে নিয়ে, বিহারের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তের জেলা শহরে ফিরে এলো।

বাড়িটাকে নিশ্চয়ই চিনতে পারছেন ? হ্যাঁ, সেই মথুরামোহন মিত্রের বাড়ি—বর্তমানে মধুসূদন এম. এ. বি. এলএর। চাকর-বাকর মালি সবই আছে, বাড়ির ও বাগানের চেহারা এক রকমই আছে। যদিও বছর খানেক অতিক্রান্ত। অমৃতার ঘরে চলুন। দেখুন। চিনতে পারছেন ? পারছেন না ? পারলেও, মনে হচ্ছে, দোতলার সেই ঘরটিতে খাটের বিছানায় অমৃতা নব কলেবরে শায়িতা। নব কলেবরই তো, তাই না ? ওর সেই দীর্ঘ কাঠামো এখন প্রায় ফুট খানেক ছোট হয়ে গেছে। মাথার চুল এত ঝরে গেছে, যেন টাক পড়েছে। রঙের কথা তোলার অর্থই হয় না। ওর ডানদিকের বুকও ক্রমাগত শুকিয়ে যাচ্ছে।

মধুসূদন কোর্টে যায়। যেতে হয়, যায়। কিন্তু আগের সেই উদ্যম নেই। ফলে ওর ক্লায়েন্টের সংখ্যাও অনেক কমেছে। কিন্তু অমৃতার সামনে যেতে পারে না। অমৃতা জানে, মধুসূদন তার কাজকর্ম নিয়মিত করে যাচ্ছে। অসময়ে এলেই বিরক্ত হয়ে বলে, 'এ কি তুমি কোর্টে যাওনি ?'

মধুসূদন বিব্রত হয়ে বলে, 'গেছলাম, আবার যাব।'

অমৃতা অস্থির হয়ে ওঠে বলে, 'না না, কোর্ট ছেড়ে তুমি কেন বারে বারে আমার কাছে আসো। আমাকে দেখবার লোকের কি অভাব রেখেছ কিছু ?'

না, মধুসূদন তা রাখেনি। দুজন সর্বক্ষণের নার্স রেখেছে দেখাশোনার জন্য। যদিও তাতেও অমৃতার আপত্তি। গত এক বছরের মধ্যে ডঃ পোদ্দার বার চারেক ঘুরে গেছেন। প্রেসকৃপশানের কিছু অদলবদল করেছেন, কিন্তু নতুন আশার কথা কিছু শোনাতে পারেননি। গম্ভীর মুখে ফিরে গেছেন, আবার ফিরে আসার আশ্বাস দিয়ে।

অজয়ের কথা আপনাদের মনে পড়ছে কী ? অমৃতা সেটা সব থেকে ভালো জানে। মধুসূদন ইতিমধ্যে যে কয়েকবার অজয়ের আগমন সংবাদ জানাতে এসেছে, অমৃতা ওর মুখের দিকে তাকিয়েই টের পেয়েছে।

গর্ভে সন্তান ধারণ করতে পারেনি, কিন্তু স্বামীটির মুখের এবং চোখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারে, তার চোখে মুখে কী অনুক্ত কথা ফুটে রয়েছে। অমৃতা মধুসূদনের ঘরে ঢোকার ভঙ্গি, চোখ মুখের অভিব্যক্তি দেখেই, কঠিন স্বরে উচ্চারণ করেছে, 'না। তুমি আর কিছু বলবার চেষ্টা কোরো না। আমি বুঝতে পেরেছি।' মধুসূদন এখন আর অমৃতার কথায় অবাক হয় না। এবং কোন রকম অনুরোধও করে না,

বা উচ্চারণও করে না। কেবল অজয় এলে, একবার ও অমৃতার সামনে এসে দাঁড়ায়। তবু একটা কথা ওর প্রায়ই বলতে ইচ্ছে করে। অজয় প্রথম যেদিন অমৃতার অসুখের কথা শুনেছিল, এবং তার পরিণতি, সেইদিনই অজয় ওর বাঁ হাতটি দরজার কব্জায় আটকে ভেঙে ফেলতে চেষ্টা করেছিল। একেবারে না ভাঙলেও, অজয়ের বাঁ হাতটি আর কার্যকরী নেই। মাংস ক্ষত বিক্ষত ছিলই, দরজার কব্জায় আটকে, চাড় দিয়ে ভাঙবার চেষ্টায়, একেবারে নিটুট আর নেই।

আমি জানি, আপনারা জীবনের এ সব ব্যাপারগুলিকে মরবিডিটি বলবেন। বলুন, কিন্তু মানুষের অন্তর, বিবেক, অনুশোচনা, পাপবোধ, যা-ই বলুন, এগুলি এতই মানবিক, তার সব প্রতিক্রিয়াগুলিকে কেবল মরবিডিটি বলে, ঠোঁট বাঁকালেই শেষ হয়ে যায় না। মধুসূদনের কাছে অজয় একদিকে যেমন ঘৃণার পাত্র, অন্যদিকে, সমস্ত ট্র্যাজেডির মধ্যে অজয় যেন এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওকে ছাড়া নিজের বলে কারোকে যেন ভাবতেও পারে না। এটাও জীবনের এক বিচিত্র খেলা। অমৃতা বুক এ্যাম্পুটেশানের আগে বলেছিল, 'পাপের স্পর্শ, মুছেই যাক।' মধুসূদন অজয়কে দেখে ভাবে, সত্যি কি তাই ? তা হলে অজয়ও কি ভাবে, ওর হাতেই পাপ ? সেই হাত ধ্বংস করাই উচিত ?

স্ত্রী আর বন্ধুর ভালোবাসার মাঝখানে, মধুসূদন একটি মানুষ, যে জীবনকে দেখছে এক বিস্ময়ের রহস্যে আবৃত। এটা এক রকমের কষ্টের অনুভূতি। ও যদি অজয়কে ঘৃণা করতে পারত, তা হলে বেঁচে যেত। তাও কখনও পারল না। অথচ অমৃতাকে হারাতে বসেছে, এই নির্মম শূন্যতাবোধের উদ্যত গ্রাসকে সহ্য করতেও পারছে না।

কয়েক দিন ধরেই অমৃতা মাঝে মাঝে চেতনা হারিয়ে ফেলছে। যখন জ্ঞান হয়, তখন ভালো করে কথা বলতে পারে না। চোখ মেলেই

কেবল মধুসূদনকে দেখতে পায়, এবং হাসে, কষ্ট করে বলে, 'এক এক সময় কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছি, আবার ফিরে আসছি। জানো মধু, আমি নানা রকম স্বপ্ন দেখছি।'

মধুসূদন জিজ্ঞেস করেছে, 'কী রকম স্বপ্ন ?'

অমৃতা বলে, 'তোমার সঙ্গে নানা জায়গায় বেড়াচ্ছি। তুমি আমাকে আদর করছ। ঠিক যেমন আগে করতে। আর প্রায়ই কী মনে হয় জানো ? আমার বোধহয় কনসেপশন হয়েছে, বুক ভারি, আর একটু যেন ব্যথা ব্যথা !'···বলতে বলতেই ওর চোখে জল এসে যায়।

মধুসূদন ইতিমধ্যে কলকাতার ডঃ পোদ্দারকে খবর পাঠিয়েছিল। তিনি এলেন। দেখলেন, এবং এবার বললেন, 'মিঃ মিত্র, মিসেস মিত্রের আয়ু আর সাতদিনের বেশি নেই। এর বেশি আর কিছু বলব না। তবু ওষুধ দেবেন, কিন্তু আমাকে আর টাকা দেবার চেষ্টা করবেন না।'

ডঃ পোদ্দারের এই শেষ কথা। যাবার আগে তিনি অমৃতাকে বললেন, 'চলি মা।'

অমৃতার ভুরু দুটো যেন একবার কুঁচকে উঠল, তারপরেই হেসে বলল, 'প্রত্যেকবার বলেন, আসি মা। এবার বললেন, চলি মা। বুঝেছি। আসুন। আমার প্রণাম নেবেন।'

ডঃ পোদ্দার কিছু বলতে গিয়েও, বলতে পারলেন না তারপরে যাবার আগে হঠাৎ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'উই নোবডি উইল রিমেন ফর গুডস্ ইন দিস্ ওয়ার্ল্ড।'···

মধুসূদন ডঃ পোদ্দারের সঙ্গে নীচে গেল। তাঁকে বিদায় জানাতে গিয়ে দেখল, অজয় নীচের ঘরে বসে আছে। দুজনে দুজনের দিকে তাকাল। কেউ কিছু বলল না। অথচ দুজনের চোখেই একটা

ব্যাকুলতা। মধুসুদন আস্তে আস্তে ওপরে গেল। ঢুকল অমৃতার ঘরে। কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অমৃতা চোখ বুজে ছিল। হঠাৎ তাকাল, চোখের তারা তুলে দেখল মধুসূদনের মুখের দিকে। কয়েক মুহূর্ত দেখে অমৃতা বলল, 'ডেকে নিয়ে এসো।'

মধুসূদনের শিরদাঁড়া কেঁপে উঠল, জিজ্ঞেস করল, 'কাকে ডাকব অমি ?'

অমৃতা হাসল, বলল, 'যে নীচের ঘরে বসে আছে, তাকে।'

মধুসূদন ঝুঁকে পড়ে যেন আর্ত্ত স্বরে ডেকে উঠল, 'অমি !'

অমৃতার যেন হাসতে কষ্ট হল, তবু হাসল, বলল, 'হ্যাঁ গো, আমি বলছি, ওকে ডেকে নিয়ে এসো।'

মধুসূদন তথাপি কয়েক মুহূর্ত পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তারপরে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে, অফিস ঘরে ঢুকল। অজয় টেবিলে মাথা নামিয়ে ছু' হাত ছড়িয়ে দিয়ে উপুড় হয়ে আছে। মধুসূদন ডাকল, 'অজয়।'

অজয় আস্তে আস্তে মুখ তুলল। চোখ লাল। অকালবৃদ্ধ, গোটা মাথাটা প্রায় ধূসর। মধুসূদন ওর চোখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলল, 'অজয়, অমি তোকে ডেকেছে।'

অজয়ের গলা দিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ বেরলো, তারপরে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ল। স্পটতই দেখা যাচ্ছে, ও কাঁপছে। কোন রকমে উচ্চারণ করল, 'মধু !'

মধুসূদন বলল, 'হ্যাঁ,। আমি কিছু বলিনি। ও আমার মুখের দিকে

তাকিয়ে নিজেই বলল। অজয়—আমি জানি না, এ কিসের ইঙ্গিত : আয়।'

মধুসূদনের পিছনে পিছনে অজয় দোতলায় উঠে এলো। ঢুকল অমৃতার ঘরে। মধুসূদন এগিয়ে গেল অমৃতার খাটের কাছে। অমৃতা চোখ বুজে ছিল। নিজের থেকেই তাকাল। মধুসূদনকে দেখে, আস্তে মুখ ফিরিয়ে দরজার কাছে অজয়ের দিকে দেখে, ডাকল, 'এসো।'

দেখুন অজয়ের পা চলতে চাইছে না, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। সে মধুসূদনের পাশে এসে দাঁড়াল।

অমৃতা বলল, 'ওখানে নয়, তুমি এপাশে এসো। মধুও পাশে এসো।' অমৃতার কথা যেন এক অলৌকিক আর দৈববাণীর নির্দেশের মতো শোনাল।

দুজন আচ্ছন্ন পুরুষ সেই নির্দেশ পালন করল যথাযথ। অমৃতার শিয়রের দু' পাশে দুজনে গিয়ে দাঁড়াল। অমৃতার দুই শীর্ণ হাতে দুটি শাঁখা মাত্র। ও দুটো হাত দুজনের দিকে ছড়িয়ে দিল। ওর এখন চোখ বোজা।

মধুসূদন অপলক চোখে অমৃতার মুখের দিকে তাকিয়ে পাথরের মতো শক্ত হয়ে আছে। অজয় থরথর করে কাঁপছে, এবং ওর গলার শিরাগুলি ফুলে উঠছে। দাঁতে দাঁত, ঠোঁটে ঠোঁট চেপেও, ও একটা অস্ফুট শব্দ চাপতে পারল না, চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে।

অমৃতা চোখ খুলে অজয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'অজয়, আমার মনে আর কোন যন্ত্রণা নেই।'

অজয় মুহূর্তে হাঁটু পেতে খাটের ওপর চিবুক ঠেকিয়ে মাটিতে বসে পড়ল, আর শিশুর মতো ফুঁপিয়ে উঠল। অমৃতা অজয়ের মাথায় হাত স্পর্শ করল। ফিরে তাকাল মধুর দিকে। মধু দেখছে, অমৃতার চোখ থেকে আলো চলে যাচ্ছে। ও অমৃতার হাত ধরে ডাকল, 'অমি।'

অমৃতা কেবল তাকিয়ে রইল, চোখের পলক পড়ল না। অথচ হাসল। একটু পরে বলল, 'তুমি ঠিক বুঝেছিলে।'...

মধুসূদনও মাটিতে বসে পড়ে ডেকে উঠল, 'অমি! অমি!'...

অজয়ের ঠোঁট নড়ছে, 'অমি অমি!'...

অমৃতার দুই চোখ আস্তে আস্তে বুজে এলো। কোন কথা বলল না। শুধু চোখের কোণ দুটি চিকচিক্ করছে।

চলুন আমরা বিদায় হই। একজন কোন কালেই আর জবাব দেবে না। দুজন আজীবন কাল কেবল ডেকেই যাবে, 'অমি, অমি, অমি!'...

মর্ম চূর্ণ হয়। ভ্রম তবু জীবনে ঘটে।